সূচীপত্র

ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন ‘কোন একজন মুসলিম ব্যক্তির হত্যার তুলনায় দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়াও আল্লাহ্র নিকটে অধিকতর হালকা বিষয়’ *(তিরমিযী হা/১৩৯৫)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com
২৯তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০২৬

আর কত রক্ত প্রয়োজন?
কবে আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা?

সূচীপত্র

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية

المجلد : ٢٩ العدد : ٤ رجب وشعبان ١٤٤٧هـ/ يناير ٢٠٢٦م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

সদ্য প্রকাশিত বই

মিশকাতুল মাছাবীহ (১ম খণ্ড)

ঈমান ও ইলম অধ্যায় (২৮০টি হাদীছ)

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

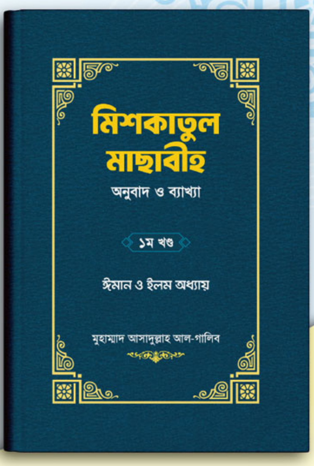

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী ব্যাখ্যা।
- সহজ, সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ।
- ৩৫টি ফায়েদা শিরোনামে ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহের প্রতিবাদ।
- ৮৯ জন রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযোজন।

পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৬৫৬ মূল্য : ৬০০

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮০৫-৯৫৮৮২২

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি। সকল বিধান বাতিল কর! অহি-র বিধান কায়েম কর।

শিরক ও বিদ'আতমুক্ত বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে

৩৬তম বার্ষিক

তাবলীগী ইজতেমা ২০২৬

নওদাপাড়া রাজশাহী।

০২ ও ০৩ এপ্রিল ২০২৬

বৃহস্পতি ও শুক্রবার

সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৯১৬-১২৫৫৮৩, ০১৭৯৭-৯০০১২৩

بسم الله الرحمن الرحيم

ISSN : 3105-4137

রেজি: নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهريـــة علميـــة دينيـــة و أدبيـــة

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

রজব-শা'বান ১৪৪৭ হি.
পৌষ-মাঘ ১৪৩২ বাং
জানুয়ারী ২০২৬ খৃ.

। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

। সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

। সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া
(আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
  (বিকাল ৪.০০ থেকে ৬.০০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনাকে ধারণ করুন! ০২
- **প্রবন্ধ :**
  - আধুনিক শিক্ষা কাঠামোতে হাদীছ পাঠদানের উদ্ভাবনী পন্থা ০৩
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব
  - আধুনিক সমাজে তাওহীদী চেতনার গুরুত্ব ১০
    -আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন
  - ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় করবেন যেভাবে ১৪
    (পূর্ব প্রকাশিতের পর) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - মুসলিম জীবনে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)* ২১
    -মুহাম্মাদ রাফাত আনাম
  - আন্তঃধর্ম সংলাপ : একটি গভীর ষড়যন্ত্র ২৫
    -সাজিদুর রহমান
- **প্রচ্ছদ রচনা :**
  - আর কত রক্ত প্রয়োজন? কবে আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা? ২৮
    -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
- **সন্তান পরিচর্যা :**
  - আগামীর নক্ষত্র গড়ে উঠুক বিনয়ের আলোয়! ৩০
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - আদর্শ অভিভাবক *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩৩
- **মহিলা অঙ্গন :**
  - ইসলামে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্ক ৩৬
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **আত্মচিন্তা :**
  - ইবাদতে লৌকিকতা *-সারওয়ার মিছবাহ* ৪০
- **কবিতা :** ৪৩
  - ঈমান ভঙ্গের ১০ কারণ
  - বাদশাহী
  - মুক্ত কর
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪
- **মুসলিম জাহান** ৪৪
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৫
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৯

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

জানুয়ারী ২০২৬

সম্পাদকীয়

২৯তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনাকে ধারণ করুন!

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয় দিবস প্রসঙ্গে বলতে গেলে কিছু অপ্রিয় ঐতিহাসিক সত্য সামনে আসে। সেদিনকার বাস্তবতা কী ছিল? আজকের প্রজন্মের অনেকেই জানেনা যে, সেদিন পাকিস্তান বাহিনী কার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল? মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী কি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন? কেন ছিলেন না? কেন সেদিন সে অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ফ্লাই করার পর মধ্য আকাশে ভারতীয় বিমান এসে হামলা করে তাকে ও তার সাথী মুক্তিযোদ্ধা ডা. জাফরুল্লাহকে ইতিহাস থেকে মুছে দিতে চেয়েছিল। কিভাবে তারা সেদিন জ্বলন্ত হেলিকপ্টার থেকে সিলেটের মাটিতে পড়ে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন, তার সঠিক উত্তর আজও কেউ দিতে পারেনি। বাস্তবে সেদিন আত্মসমর্পণ হয়েছিল ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কম্যাণ্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কম্যাণ্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজীর। ভারতের তৎকালীন ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেতারা তাদের ১৬ই ডিসেম্বরের ভাষণে সর্বদা ভারতীয় সেনাবাহিনীর কৃতিত্বের কথাই তুলে ধরেন। সেখানে আমাদের অগণিত মুক্তিযোদ্ধার বিরল আত্মত্যাগের কোন উল্লেখ নেই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি বুঝতে গেলে ১৯৪৭ সালের ভারতবিভাগের দর্শনে ফিরে যেতে হবে। আর সেটি ছিল দ্বিজাতি তত্ত্বের দর্শন। ইসলামের জন্যই সেদিন এ স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্ম হয়েছিল। একই গুজরাটী বংশোদ্ভূত দুই নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বলেছিলেন, *উই আর ফার্স্ট ইণ্ডিয়ান, দেন হিন্দু অর মুসলিম'* (আমরা প্রথমে ভারতীয়, পরে হিন্দু বা মুসলিম)। কিন্তু এর জওয়াবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, *'উই আর ফার্স্ট মুসলিম, দেন ইণ্ডিয়ান'* (আমরা প্রথমে মুসলমান, পরে ভারতীয়)। আকাশ-পাতাল ব্যবধান এই আদর্শিক পার্থক্যের কারণেই মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। তাই দু'হাযার মাইল দূরত্বের পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান মিলে একটি ঐক্যবদ্ধ 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু অদূরদর্শী ও হঠকারী শাসকের যুলুমের কারণে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ শুরু হয়। যাকে দমন করার জন্য তারা পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে। ফলে বহু নিরপরাধ মানুষ হতাহত হয়। প্রাণে বাঁচার জন্য অসংখ্য মানুষ সেদিন প্রতিবেশী ভারতে আশ্রয় নেয়। তখন তারা এই সুযোগটি গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শেষদিকে এসে ৩রা ডিসেম্বর তারা সরাসরি তাদের সেনাবাহিনী নামিয়ে দেয়। অতঃপর ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের পতন হয়। মেহেরপুর বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে ১৭ই এপ্রিল স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হয়, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নামে। যা ছিল এদেশের মানুষের চেতনার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু আজ সেই ইতিহাসকে মুছে ফেলে সেখানে কেবল পূজা হচ্ছে। পূজা চলছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যান্টনমেন্ট ও কথিত শহীদ মিনারগুলিতে। যা ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিরোধী। অথচ এই চেতনা হারিয়ে গেলে এপার বাংলা-ওপার বাংলার মধ্যে নৈতিক কোন পার্থক্য আর থাকবে না। বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব একদিন ভারতের মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে পারে। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর '৭২ সালের সংবিধান প্রণয়নের সময় চাপিয়ে দেওয়া হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। আজও বাংলাদেশে ভারতের চাপিয়ে দেওয়া সেই চার মূলনীতিরই চর্চা হচ্ছে। যা আমাদের স্বাধীনতার মূল চেতনার পরিপন্থী। যদিও জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' সংযোজন করে সেই ইসলামী চেতনা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছেন।

আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহকে মুছে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। অথচ ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানকে দিতে হবে। নাহ'লে এই ভূখণ্ডের মানুষ না খেয়ে মরবে। কেননা চট্টগ্রাম হ'ল বাণিজ্যিক বন্দর এবং পাহাড়গুলির নিচে রয়েছে বিভিন্ন খনিজ সম্পদের অমূল্য ভাণ্ডার। অবশেষে নেহেরুকে পূর্ব পাঞ্জাব দিয়ে দেয়ার বিনিময়ে তিনি সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করেন। জিন্নাহর সেই আত্মত্যাগ ও দূরদর্শিতার কারণেই আজ আমরা স্বাধীনভাবে চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যবহার করতে পারছি। তবুও বাদ পড়ে গিয়েছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং সিলেটের করিমগঞ্জ যেলা। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে পাহাড়ী যেলাগুলিতে ১৫ বিঘা করে জমি দিয়ে সেখানে মুসলমানদের বসতি স্থাপন করেন। যারা এখন বাঙ্গালী ও পাহাড়ী সংখ্যার ভারসাম্য রক্ষার মাধ্যমে এদেশের মানচিত্রকে অটুট রেখেছে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বিজয়ের এই মাসে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদ বিরোধী বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শরীফ ওছমান বিন হাদীকে প্রাণ হারাতে হ'ল। দিনে-দুপুরে গুলিবিদ্ধ হওয়ার এক সপ্তাহ পর সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৮ই ডিসেম্বর বৃহঃস্পতিবার দিবাগত রাত পৌনে ১০টায় তার মৃত্যু হয়। মাত্র ৩২ বছর বয়সে থেমে গেল তার প্রতিরোধ সংগ্রাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনাকে ধারণ করতে চেয়েছিলেন বলেই এই তরতাজা নওজোয়ানের মৃত্যুতে দল-মত নির্বিশেষে শোকে মুহ্যমান সারা বাংলাদেশ। তার জানাযায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ও মানিক মিয়াঁ এভিনিউ কানায় কানায় মুছল্লীতে ভরে যায়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জানাযার পর এতবড় জানাযা এযাবৎ এখানে হয়নি। সেখানে লাখো কণ্ঠে উচ্চারিত মুহুর্মুহু 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার' ধ্বনি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের মানুষ এক নতুন ইসলামী বাংলাদেশের জন্য কতটা উন্মুখ। কিন্তু কাদের হাতে এই বিপ্লবী তরুণকে জীবন দিতে হ'ল? ভারতীয় আধিপত্যবাদ নাকি আভ্যন্তরীণ কায়েমী স্বার্থবাদ? আগামীর ইতিহাসই তা বলে দেবে। জাতীয় কবি কাজী নজরুলের 'বল বীর- বল উন্নত মম শির!' ছিল তার বিপ্লবী কণ্ঠের নিত্য উচ্চারণ। তাই প্রিয় কবির কবরের পাশেই তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার গোনাহ-খাতা মাফ করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন। আমীন!

সুতরাং নতুন বাংলাদেশ গঠনে দেশের সকল মহলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা ইসলামকে ধারণ করুন। তবেই আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা পেতে পারে এবং একদিন এদেশ প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধি, ন্যায় ও ইনছাফের পথে পরিচালিত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।- আমীন! *(স.স.)*।

আধুনিক শিক্ষা কাঠামোতে হাদীছ পাঠদানের উদ্ভাবনী পন্থা

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ভূমিকা :

ইসলামী জ্ঞানের অন্যতম প্রধান উৎস হ'ল হাদীছ, যা মূলতঃ রাসূল মুহাম্মাদ (ছা.) প্রদত্ত পবিত্র কুরআনের ভাষ্য বা ব্যাখ্যা। এজন্য কুরআনের সাথে সাথে হাদীছও ইসলামী শরী'আতের অন্যতম মূল উৎস। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় হাদীছ শিক্ষাদান, হাদীছের পঠন-পাঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকেই হাদীছ অধ্যয়ন ও পঠন-পাঠনের কাজ শুরু হয়। অতঃপর যুগ যুগ ধরে হাদীছ সংরক্ষণ ও শিক্ষাদানে মুসলিম ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যা মূলত সনদ (বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা) এবং মতন (মূল পাঠ)-এর বিশুদ্ধতা রক্ষায় বিশেষ মনোযোগী ছিল। বাংলাদেশে মাদ্রাসাসমূহে হাদীছ শিক্ষাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে সাধারণতঃ যুগ যুগ ধরে চলে আসা সনাতন (Traditional) পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। তবে তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ প্রসারের এই যুগে এসে শিক্ষাবিজ্ঞানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। আধুনিক শিক্ষানীতিতে শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষণ, সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিকাশের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে হাদীছ শিক্ষার পদ্ধতিও আধুনিক শিক্ষাগত চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করা প্রয়োজন।[১] শুধু মুখস্থকরণ বা শ্রবণের পরিবর্তে হাদীছের গভীর অনুধাবন, বিশ্লেষণ এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর গুরুত্বারোপ করা এখন সময়ের দাবী।

বাংলাদেশে হাদীছ শিক্ষা কাঠামো :

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় হাদীছ পাঠদান মূলত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থায় প্রধান দু'টি ধারা বিদ্যমান– (১) আলিয়া মাদ্রাসা এবং (২) কওমী মাদ্রাসা। অপর একটি ধারা হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক উচ্চতর বিভাগ। নিম্নে উভয়বিধ মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে হাদীছ পাঠদানের বর্তমান চিত্র উল্লেখ করা হ'ল।

(১) আলিয়া মাদ্রাসা : এই ধারাটি জাতীয় শিক্ষা কাঠামোর সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে একীভূত। এই ব্যবস্থায় ঐতিহ্যবাহী ইসলামী বিষয় যেমন কুরআন, হাদীছ এবং ফিক্বহের সাথে সাধারণ একাডেমিক বিষয় যেমন বিজ্ঞান, গণিত এবং ইংরেজী পড়ানো হয়। এটি ইবতেদায়ী (প্রাথমিক) থেকে কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তর পর্যন্ত একটি সুসংগঠিত শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে, যেখানে হাদীছ অধ্যয়ন একটি কেন্দ্রীয় উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়, বিশেষ করে উচ্চতর ফাযিল (স্নাতক) এবং কামিল (স্নাতকোত্তর) স্তরে।

কামিল পাঠ্যক্রমে কুতুবে সিত্তাহ (বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ), উছূলুল হাদীছ (হাদীছ শাস্ত্রের মূলনীতি), ইলমুর রিজাল (বর্ণনাকারী রাবীদের জীবনী) এবং ইলমুল জারাহ ওয়াত-তা'দীল (বর্ণনাকারী রাবীদের সমালোচনা)-সহ প্রধান প্রধান হাদীছ গ্রন্থগুলো গভীরভাবে অধ্যয়ন করা হয়। ১৯০৭ সালে বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ হাদীছ ক্লাস চালু হয় এবং কামিল স্তরে হাদীছ বিষয়ে তিন বছরের কোর্স চালু করা হয়।[২]

(২) কওমী মাদ্রাসা : কওমী মাদ্রাসাগুলো বেসরকারী তত্ত্বাবধানে স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়। এগুলি মূলত দরসে নিযামী পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে, যা আরবী সাহিত্য এবং ইসলামী শরী'আহ, যেমন তাফসীর, হাদীছ ও ফিক্বহ অধ্যয়নের উপর ব্যাপক জোর দেয়। কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মৌলিক দিক হ'ল হাদীছ গ্রন্থগুলোর ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন। অনেক কওমী মাদ্রাসায় হাদীছ অধ্যয়নের জন্য বিশেষায়িত 'দাওরাতুল হাদীছ' বিভাগ রয়েছে, যা হাদীছ বিশ্লেষণ ও তার তাত্ত্বিক অধ্যয়নের উপর জোর দেয়। তারা 'তাখাছ্ছুছ' বিভাগ নামে উচ্চতর হাদীছ গবেষণা বিভাগও পরিচালনা করে।[৩]

তবে পদ্ধতিগতভাবে এতে পাঠদান পদ্ধতি এখনও প্রাচীন ও টেক্সট-নির্ভর। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রায়শই হাদীছের মূল বার্তা অনুধাবন না করে মুখস্থনির্ভরতা অর্জন করে। এতে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতির সাথে সমন্বয়ের বিশেষ সুযোগ নেই এবং প্রযুক্তির ব্যবহারও এতে খুবই সীমিত।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক উচ্চতর বিভাগ : সরকারী-বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ইসলামিক স্টাডিজ' বিভাগ ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'হাদীছ' বিভাগের অধীনে অনার্স (স্নাতক) ও মাস্টার্স (স্নাতকোত্তর) স্তরে হাদীছের বিশেষায়িত পাঠদান করা হয়। এখানে সিলেবাস তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং সময়োপযোগী। এতে উচ্চতর গবেষণার যথেষ্ট সুযোগ আছে।[৪] তবে বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও হাদীছ পাঠদানের ক্ষেত্রে সাধারণত সনাতনী পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়।

---

১. *Rosdi, A. Z., Hassan, S. N. S., & Muhamad, N. A. F. Traditional and Modern Hadith Studies: A Literature Review. al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, (2019, 13(2), P. 40-53.*

২. *Md. Safiqul Islam, A Brief History of Govt. Madrasah-E-Alia, Dhaka. (1780-2025), accessed June 10, 2025, https://www.dhkgovmalia.edu.bd/index.php?request=about-us-eng*

৩. *Muhammad Boni Amin, Madrasah Education in Bangladesh (IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD) note series-2, www.ideasfd.org/), 2013, p.3.*

৪. *Latifah Abdul Majid & others, Exploring Innovations and Challenges in The Study of Hadith in The Digital Era, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 1 4 , No. 3, 2024. p. 1048. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v14-i3/20957.*

বাংলাদেশের প্রচলিত হাদীছ পাঠদান পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা

প্রাচীনকাল থেকে হাদীছ শিক্ষাদানের প্রধান পদ্ধতিগুলো হ'ল সামা‘ (السَّمَاعُ) (শ্রবণ), ক্বিরাআত (الْقِرَاءَةُ) (পাঠ), ইজাযাহ (الْإِجَازَةُ) (অনুমতি), মুনাওয়ালাহ (الْمُنَاوَلَةُ) (হস্তান্তর)[৫] ইত্যাদি। সামা‘ এবং ক্বিরাআত পদ্ধতি হাদীছের বিশুদ্ধতা রক্ষায় অত্যন্ত কার্যকর হ'লেও আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধারার পাঠদানে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন-

(১) শিক্ষার্থীর নিষ্ক্রিয়তা ও অনুধাবনের অভাব :

সামা‘ (শ্রবণ) পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মূলত নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হিসাবে থাকে, যা তাদের মধ্যে অনেক সময় শেখার আগ্রহ ও উদ্দীপনা কমিয়ে দেয়। এতে শুধুমাত্র মুখস্থকরণ বা শ্রবণের উপর জোর দেওয়ায় হাদীছের গভীর অর্থ, প্রেক্ষাপট এবং সমকালীন প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ থাকে।

(২) মুখস্থ ও অনুবাদনির্ভর শিক্ষা :

বাংলাদেশে হাদীছ পাঠদানের স্বাভাবিক চিত্র হ'ল একজন শিক্ষক বা মুহাদ্দিছ কোন নির্দিষ্ট হাদীছ গ্রন্থ থেকে ধারাবাহিকভাবে হাদীছের অনুবাদ করবেন আর শিক্ষার্থীরা তা শুনবেন। কখনও শিক্ষার্থীরা ধারাবাহিকভাবে পড়তে থাকবে। আর শিক্ষক শুনতে থাকবেন এবং প্রয়োজন মনে করলে কোন হাদীছের অর্থ করে দিবেন। এইভাবে পুরো গ্রন্থ পড়া ও শোনার মধ্য দিয়েই শেষ হয়ে যায়। আর কিছু হাদীছ মুখস্থ করার এবং তা পরীক্ষায় উপস্থাপন করার মাধ্যমে হাদীছ পাঠের এই গুরুদায়িত্ব সম্পন্ন করেন। এক শিক্ষাবর্ষে একটি বড় হাদীছ গ্রন্থ ধারাবাহিকভাবে পড়ে শেষ করা অথবা নির্ধারিত সিলেবাস পড়ে শেষ করাই প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হিসাবে ধরা হয়। হাদীছের অর্থ অনুধাবন, শরী‘আতের বিধান উদ্ভাবন, নিজ সমাজ ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট থেকে হাদীছকে বিশ্লেষণের বিশেষ কোন আবেদন সেখানে উপস্থিত থাকে না। ফলে হাদীছ পাঠদান স্রেফ মুখস্থ এবং আংশিক অনুবাদ নির্ভর হয়ে যায়, যা থেকে শিক্ষার্থীদের হাদীছের ইবারত বা টেক্সট পাঠে দক্ষতা অর্জন ছাড়া আর বিশেষ কিছু অর্জন করার সুযোগ থাকে না।

(৩) শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা বিকাশের ঘাটতি : হাদীছের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়, সনদ বিশ্লেষণ, শারঈ মাসআলা উদ্ভাবন, সমকালীন প্রেক্ষাপটের আলোকে হাদীছের নির্দেশনা অনুধাবন ইত্যাদির তেমন কোন সুযোগ নেই প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায়। এর পিছনে প্রধানত দু'টি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ একজন শিক্ষককে খুব সীমিত সময়ের মধ্যে বিশাল সিলেবাস পড়ানোর দায়িত্ব নিতে হয়, যা তাকে শিক্ষার্থীদের সাথে নতুন উদ্ভাবনী আলোচনায় সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ দেয় না। এতে হাদীছের জটিল বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করার সুযোগ খুব কম থাকে, যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার বিকাশ হ'তে দেয় না। দ্বিতীয়তঃ সুনির্দিষ্ট কোন মাযহাবকে কেন্দ্র করে হাদীছ অধ্যয়নের কারণে অন্য মাযহাবসমূহের গৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নিজের অনুসৃত মাযহাবী বিদ্বানদের সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার প্রদানই হাদীছের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাধারার উন্মুক্ত অনুশীলনের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদেরকে একমুখী চিন্তাধারায় গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলা হয়।

(৪) প্রাচীন আরবী ভাষার সাথে সম্পর্ক না থাকা ও পরিভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা : হাদীছ পাঠদানের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রাচীন আরবী ভাষারীতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও বিভিন্ন অপ্রচলিত পরিভাষার সাথে পরিচিত না থাকা। উচ্চতর আরবী ভাষা, অলংকার শাস্ত্র, মূলনীতি শাস্ত্র প্রভৃতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকার কারণে হাদীছ পাঠদান, পঠন ও অনুধাবন প্রায়শই বাধাগ্রস্ত হয়।[৬]

(৫) প্রযুক্তির ব্যবহার না থাকা : আধুনিক যুগে হাদীছ পাঠদানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হ'ল প্রযুক্তির ব্যবহার সঠিকভাবে না জানা। কেননা হাদীছের বিশাল বিশাল গ্রন্থসমূহ বর্তমানে প্রযুক্তির কল্যাণে ডিজিটাল গ্রন্থে পরিণত হয়েছে, যা থেকে খুব সহজেই যে কোন হাদীছ ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগুলো জানা সম্ভব হয়। কেবল মাকতাবা শামেলা নামক ওয়েবসাইটে প্রযুক্তির যে অপরূপ সন্নিবেশ ঘটানো হয়েছে, তা যেন হাদীছ পাঠদানের সমস্ত উপকরণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে চলে এসেছে। হাদীছের শব্দ বিশ্লেষণ, অর্থ বিশ্লেষণ, সনদ বিশ্লেষণ, রাবীদের জীবনী ও তাদের গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয় ইত্যাদি এখন কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, যা ইতিপূর্বে দিনের পর দিন গবেষণা করেও বের করা সহজ ছিল না। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় বিদ্বানগণ প্রযুক্তি ব্যবহারে বিশেষ স্বচ্ছন্দ না থাকার কারণে এই বিরাট জগতের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক তৈরী হয় না। ফলে হাদীছ পাঠদানে প্রযুক্তি তারা নিজেরাও ব্যবহার করেন না, অপরকেও উৎসাহিত করেন না। যা হাদীছ পাঠদানের ক্ষেত্রে এক বিশাল ব্যবধান তৈরী করেছে। এটি বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের জন্য হাদীছ শিক্ষাকে অধিকতর উপযোগী করার ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।[৭]

(৬) পাঠদানের সাথে সমাজ ও সংস্কৃতির বাস্তব ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকা : বর্তমান সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে শরী‘আতের দিক-নির্দেশনা কি হবে তা নির্ণয় করতে হাদীছের সঠিক ও

৫. *খত্বীব আল-বাগদাদী, আল-কিফায়াহ ফী ইলমির রিওয়ায়াহ (মদীনা : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়াহ, তাবি), পৃ. ৩১১-২৬।*

৬. *Klaina, M.. Facilitation and Understanding in Hadith Studies, AL-IKHSAN: Interdisciplinary Journal of Islamic Studies, (2024) 2(2), 120–143. https://doi.org/10.61166/ikhsan.v2i2.85.*

৭. *Bin Sayeed Dr Mahmud, Major Challenges of Islamic Education in Bangladesh and Solutions, (January 12, 2025), https://dazzlingdawn.com/ .*

যুগোপযোগী ব্যাখ্যার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে হাদীছ পাঠদান কালে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সাথে হাদীছের সামগ্রিক অর্থের চেয়ে নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন বলে হাদীছ পাঠদান হয়ে যায় একঘেঁয়ে এবং অতীত নির্ভর, যা সমকালীন যুগের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট হয় না।[৮]

(৭) পাঠদানের ক্ষেত্রে গবেষণা উপকরণের অভাব :

হাদীছ পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বই-পত্রসহ অন্যান্য গবেষণা উপকরণ না থাকা হাদীছ পাঠদানে এক বিশাল অনগ্রসরতার পরিচয় বহন করে। সকল বিষয়ের ব্যবহারিক (Practical) অংশে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে তার অর্জিত শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু হাদীছ শিক্ষার্থী দেরকে অনুরূপ কোন ব্যবহারিক ক্লাস সাধারণতঃ দেয়া হয় না, যার মাধ্যমে তারা একক বা দলগত উপায়ে হাদীছ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করবে। এছাড়া কম্পিউটার, ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা না থাকায় হাদীছ গবেষণাও প্রাচীন আবহেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়।[৯]

আধুনিক শিক্ষাকাঠামোর বৈশিষ্ট্য :

শিল্পবিপ্লবের পর থেকে প্রাচীন শ্রুতি ও মুখস্থনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। শিক্ষার লক্ষ্যে যেমন পরিবর্তন ঘটেছে, তেমনি শিক্ষার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াতেও পরিবর্তন এসেছে। পূর্বযুগে পড়াশোনার মূল লক্ষ্য ছিল নৈতিকতা ও মানবিকতার উৎকর্ষ সাধন। কিন্তু আধুনিককালে উপার্জন, কর্মসংস্থান ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনই শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এজন্য ধর্ম, সাহিত্য ও দর্শনের চেয়ে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরী বিদ্যাই মানুষের আগ্রহের বিষয়বস্তু। মুখস্থ বিদ্যার পরিবর্তে আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ, গবেষণা ও সমালোচনামূলক চিন্তনের বিকাশ আধুনিক শিক্ষাধারার অন্যতম দিক। শিক্ষকগণ এতে যতটা না গুরুর ভূমিকায়, তার চেয়ে বেশী মেন্টর বা গাইডের ভূমিকায় থাকেন। ছাত্ররা এখানে কেবল শিক্ষার্থী নয় বরং জ্ঞানার্জনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। পাঠ্যবই ভিত্তিক শিক্ষার চেয়ে বাস্তবমুখী শিক্ষা এখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক নয় বরং শিক্ষার্থীই মূল কেন্দ্রবিন্দু। পড়াশোনায় প্রযুক্তি ও মাল্টিমিডিয়া এখন অপরিহার্য মাধ্যম। নিয়মিত পড়াশোনার বাইরে সহপাঠমূলক কার্যক্রমকে অপরিহার্য যোগ্যতা হিসাবে দেখা হয়। সর্বোপরি আধুনিক শিক্ষাকাঠামোতে বাস্তবমুখী ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিটি মানুষের একটি আবশ্যিক চাহিদা হিসাবে পরিগণিত হয়।

আধুনিক শিক্ষা কাঠামোতে হাদীছ পাঠদানের উদ্ভাবনী পন্থাসমূহ

আধুনিক শিক্ষা কাঠামোতে হাদীছ শিক্ষার চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলায় বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিকভাবে বিভিন্ন উদ্ভাবনী শিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিগুলো মুখস্থনির্ভরতা কমিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গভীর উপলব্ধি, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। বিশ্বায়নের এই যুগে হাদীছ পাঠদান পদ্ধতিকে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী করার জন্য নিম্নোক্ত পন্থাসমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে।

ক. পারস্পরিক আলোচনাভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি :

সরাসরি হাদীছ ধারাবাহিকভাবে পাঠ করা কিংবা অনুবাদের পরিবর্তে শ্রেণীকক্ষে হাদীছ পাঠদানকে আকর্ষণীয় করার জন্য কয়েকটি পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন–

(১) নির্দিষ্ট হাদীছ গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় (كتاب)-কে প্রথমে মূলপাঠ হিসাবে ধরে নিয়ে দারস বা পাঠদান শুরু করা এবং সারাংশমূলক আলোচনা করা।[১০]

(২) উক্ত অধ্যায়ভুক্ত অনুচ্ছেদ (باب) গুলো সম্পর্কে প্রথমে সামগ্রিক ধারণা দেয়া, অতঃপর অন্তর্ভুক্ত হাদীছগুলোকে অধ্যায় ও অনুচ্ছেদের সাথে সমন্বয় (التطبيق) প্রদান করা, তার অন্যান্য সূত্র (طرق الحديث) গুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং সবশেষে তার উপর সাধারণ আলোচনা-ভিত্তিক ক্লাস, শব্দ ও অর্থ বিশ্লেষণ, প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং সমাজের বাস্তব সমস্যা শারঈ দৃষ্টিভঙ্গিতে (مقاصد الشريعة) পর্যালোচনার মাধ্যমে পাঠদান করা।[১১] এই পদ্ধতির পাঠদানকে হাদীছের বিষয়বস্তু ভিত্তিক পাঠদান (الحديث الموضوعي) বলা হয়, যার মাধ্যমে হাদীছের বিষয়ভিত্তিক একটি পরিপূর্ণ ধারণা দেয়া যায়।[১২]

(৩) হাদীছের তাখরীজ (التخريج) বা অন্যান্য সূত্রের বর্ণনাগুলোকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে হাদীছটির বিভিন্ন সনদ বিশ্লেষণ, অন্যান্য সূত্রের বর্ণনা থেকে হাদীছটির পাঠভিন্নতা, শব্দ ও অর্থগত বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি ফিক্বহী বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাদীছটির উপর পূর্ণ ধারণা অর্জন করা যায়। এই পদ্ধতির পাঠদানকে হাদীছ ভিত্তিক পাঠদান (الحديث التحليلي) বলা হয়, যার মাধ্যমে কোন একটি

---

৮. Ibid.

৯. Ali, R.. Paradigm Shifts in Islamic Curriculum: A Literature Review. Journal of Islamic Studies and Education, (2019, 8(3), 210–225.

১০. ড. ওয়াজীহ আল-মুরসী আবুলাবান, ইলমুল হাদীছ আশ-শারীফ ওয়া ইজরাআতু তাদরীসিহি https://kenanaonline.com/users/maiwagieh/posts/268198), সংগ্রহ : ২৬.০৬.২০২৫।

১১. ড. ত্বহা আহমাদ আয-যায়দী, ইমকানিয়াতুত তাতাওউর ফী দিরাসাতিল হাদীছ ওয়া উলূমিহি (একতা ইসলামিকা, ৪র্থ খণ্ড, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-জুলাই ২০১৬খ্রি.), পৃ. ১৪৮।

১২. هو علمٌ يبحث في الموضوعات التي تناوَلتها السُّنة النبوية الشريفة، والمتحدة معنىً، أو غاية، من خلال جمْع أحاديث الموضوع من مصدر حديثي أصلي، أو عدة مصادر، أو في ضوء السُّنة النبوية، بحيث يقوم الباحث بتحليل النصوص الحديثية المقبولة ومقارنتها ونقْدها ثم محاولة ربْطها للوصول إلى روح النصِّ النبوي من أجل تطبيقه في الواقع المعاصر -রামাযান ইসহাক আয-যাইয়ান, আল-হাদীছুল মাওযূঈ দিরাসাহ নাযরিয়াহ (গাযা : মাজাল্লাতুল জামিআহ আল-ইসলামিয়াহ, ১০ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২১৪।

হাদীছের আদ্যোপান্ত সবিস্তার জানা সম্ভব হয়।[১৩]

(৪) হাদীছের রাবী এবং সংযোগসূত্রের রাবী (مدار الإسناد) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা, যাতে হাদীছের সনদ ও মতনগত আলোচনা আরো বেশী সূক্ষ্ম হয় এবং হাদীছের সনদ ও মতনের জটিল বিষয়গুলো শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারে। এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই সমানভাবে সক্রিয় থাকে। ফলে স্বল্পসময়ে পাঠদানের মূল উদ্দেশ্য হাছিল হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের সচেতন অংশগ্রহণের কারণে পাঠ্যবিষয়টি শিক্ষার্থীরা সামগ্রিকভাবে ধারণ করতে পারে।[১৪]

খ. সক্রিয় শিক্ষণ (Active Learning) **পদ্ধতি :**

সক্রিয় শিক্ষণ শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়ায় সরাসরি জড়িত করে, যা তাদের জ্ঞান ধারণ ক্ষমতা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে। যেমন– (১) শিক্ষার্থীদের ছোট দলে ভাগ করে নির্দিষ্ট হাদীছের উপর গবেষণা, বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনার কাজ (Project) দেওয়া যেতে পারে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যে জ্ঞান আদান-প্রদান করতে পারবে এবং উপস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। (২) শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে 'পিয়ার লার্নিং' (Peer Learning)-এর মাধ্যমে একে অপরকে হাদীছ শেখাতে পারে, যাতে তাদের বোধগম্যতা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন طريقة التكرار (Group Discussions) পদ্ধতির সাথে এর মিল রয়েছে, তবে এর পার্থক্য হ'ল প্রত্যেকেই এতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং দলগতভাবে সমস্যার সমাধান করে। ফলে সকল শিক্ষার্থীর মাঝেই গড়পড়তা দক্ষতা অর্জিত হয়। (৩) হাদীছের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর এবং বিতর্ক সেশনের আয়োজন করা যেতে পারে, যেখানে তারা হাদীছের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করতে পারবে এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। এক্ষেত্রে কেস স্টাডি (Case Studies), এবং হাতে-কলমে অনুশীলন (hands-on practice) পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। (৪) ক্ষেত্র অধ্যয়ন (Field Study) তথা হাদীছের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত বাস্তব স্থান বা পরিস্থিতি পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা, যা শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানমূলক জ্ঞান (Problem-based Learning) এবং অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞান (Experiential Learning) অর্জনে সহায়তা করবে। (৫) বিশেষ গবেষণা প্রকল্প (Research Project) তৈরী করা, যার মাধ্যমে হাদীছ শিক্ষার্থীরা উচ্চতর গবেষণামুখী হবে এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে রাসূল (ছা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন পর্যালোচনা করতে পারবে, তেমনি সুন্নাহভিত্তিক সমাধানের পথ উন্মুক্ত করতে পারবে।[১৫] এভাবে দলগত আলোচনা, সহপাঠ্য কার্যক্রম এবং অনুকূল শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ শিক্ষার্থীদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা উৎসাহিত করে, পাঠ আত্মস্থ করতে সহায়তা করে এবং তাদের ভুল শনাক্ত করতে, জবাবদিহিতা বজায় রাখতে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।

গ. প্রসঙ্গভিত্তিক শিক্ষণ (Contextual Learning) **পদ্ধতি :**

সমকালীন কেস স্টাডি ও বাস্তব জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদেরকে হাদীছের আলোকে সমস্যা সমাধানের জন্য উৎসাহিত করা যেতে পারে। যেমন একটি সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে কোন হাদীছটি প্রযোজ্য এবং কিভাবে তা সমাধান করা যায়। এছাড়া নির্দিষ্ট কোন হাদীছকে বিষয়বস্তু হিসাবে নিয়ে গবেষণা প্রকল্প (Project assignments) তৈরী করা যেতে পারে। এতে হাদীছটির ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করা ও তার সামাজিক প্রভাব ব্যাখ্যা করা, তার শিক্ষাগুলো বর্তমান সমাজের প্রেক্ষাপটে (Real-world contexts) কিভাবে প্রযোজ্য এবং তার বাস্তবিক প্রয়োগ কি হ'তে পারে, তা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গবেষণা ও বিশ্লেষণী (Critical Thinking) দক্ষতার উন্মেষ ঘটে।[১৬] এই ধরনের কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের চিন্তাশীলতা ও গবেষণামনস্কতা বাড়ায়। এজন্য সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক প্রজেক্ট নির্ধারণ করার মাধ্যমে হাদীছ পাঠদানকে অধিকতর কার্যকর করা সম্ভব।[১৭]

ঘ. বিভিন্ন জ্ঞানের সাথে সমন্বয় পদ্ধতি :

হাদীছ পাঠদানকালে হাদীছের বিষয়বস্তুর সাথে সীরাহ, ইতিহাস, ফিক্বহ, আরবী ভাষা, সমাজবিজ্ঞান, প্রকৃতি বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমকালীন বিশ্ব ইত্যাদির সাথে সমন্বয় ঘটালে বিষয়বস্তুর গভীরতা ও প্রাসঙ্গিকতা বেড়ে যায়।[১৮] শিক্ষার্থীদের মধ্যে দূরদর্শিতা ও জ্ঞানার্জনের প্রতি প্রবল তৃষ্ণা

১৩. *هو التركيز على حديثٍ واحدٍ بتخريجه، وبيان درجته قبولًا وردًّا، وجمع الألفاظ التي رُوي بها قدر الطاقة والإمكان، لأنها تساعد على فهمه، وخصوصًا في التأليف بين المتعارضات، وبيان معاني المفردات والجمل والبلاغة والإعراب، لما لذلك من دورٍ في إبراز المعنى وتوضيحه. وأيضًا سبب الورود – إن وُجد – لمعرفة اللفظ وما يُراد به، وبيان فقهه في ضوء - لفظه، وفي ضوء النصوص الأُخرى، ثم ما يُستفاد منه من أحكام إجمالًا* *ড. আব্দুস সামী আল-আনীস, মানহাজুল বাহছ ফিল হাদীছিত তাহলীলী বায়নাল আছালাতি ওয়াল মুআছারাহ (মাজাল্লাতু জামিআতুশ শারিকাহ, ২০২০), পৃ. ৫। www.spu.sharjah.ac.ae/index.php /JSIS/article/view/2289.*

১৪. *ড. ত্বহা আহমাদ আয-যায়দী, তাদরীসুল হাদীছ আন-নাবাভী ওয়া উলূমিহি : আল-আছালাতু ওয়াল মুআছারাহ (জর্ডান : দারুন নাফায়েস, ২০১৩ খ্রি.), পৃ. ১৪১, ১৫৭-৫৮;*

১৫. *ড. ত্বহা আহমাদ আয-যায়দী, ইমকানিয়াতুত তাতাওউর ফী দিরাসাতিল হাদীছ ওয়া উলূমিহি , পৃ. ৪২৪।*

16. *Muniroh Nunung, Critical Thinking and Attitude in Islamic Education: A Literature Review, (BESTARI: Jurnal Pendidikan Islam), Vol. 21, No. 2, 2024, 164-174.*

17. *Paul, R., & Elder, L. Critical Thinking: The Nature of Critical and Creative Thought. Journal of Developmental Education, 2006, 34.*

18. *Rahmiati & others, Enhancing Qur'an-Hadith Education through Science, Technology, and Society Approach: A Developmental Study (Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan Vol.17, 2, June, 2025), p. 2302-2314.*

বৃদ্ধি পায়। এটি তাদের সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং নৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতেও সহায়ক।[১৯] তদুপুরি এর মাধ্যমে হাদীছের শিক্ষাকে পরিবেশ সচেতনতা, ন্যায়বিচার, সহনশীলতা এবং সামাজিক সংঘাত সমাধানের মতো সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ব্যবহার করা যেতে পারে।[২০] এভাবে এই আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতির[২১] মাধ্যমে প্রথমতঃ হাদীছ শিক্ষাকে সমসাময়িক জীবনের জন্য আরও প্রাসঙ্গিক করে তোলা সম্ভব হবে এবং এর মাধ্যমে এমন এক প্রজন্ম তৈরি হ'তে পারে যারা ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে, যার ফলে তাদের কর্মসংস্থান এবং সমাজের সাথে সম্পৃক্ততা উভয়ই বৃদ্ধি পাবে। দ্বিতীয়তঃ হাদীছ শিক্ষা একটি নির্দিষ্ট মাযহাব কেন্দ্রিক হওয়ার পরিবর্তে আন্তঃমাযহাব সমন্বয়মূলক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটবে এবং এর মাধ্যমে মাযহাবী ফিক্বহ (فقه المذاهب) -এর পরিবর্তে হাদীছ ভিত্তিক ফিক্বহ (فقه الحديث والسنة)-এর অনুশীলন জোরদার হবে, যা মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতকে লঘু করে উম্মাহর সামগ্রিক ঐক্যসাধন এবং জ্ঞানগত উৎকর্ষ সাধনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।[২২]

৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার :

২০১৩ সাল থেকে শিক্ষাবিজ্ঞানে টেকনোলজির ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হ'তে থাকে। তবে ২০২০ সালে করোনা মহামারীর আবির্ভাবের পর বিশ্ব শিক্ষা ব্যবস্থা টেকনোলজির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে মিডিয়া ও প্রযুক্তির এই অগ্রযাত্রার যুগে হাদীছ পাঠদানে ডিজিটাল মাধ্যমের ব্যবহার অতীব যরূরী।[২৩] বিশেষত বর্তমানে ডিজিটাল হাদীছ ডেটাবেজ ও হাদীছ অ্যাপের মাধ্যমে হাদীছ অনুসন্ধান, সনদের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই, হাদীছের সামগ্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাতের মুঠোয় চলে এসেছে, যার সাথে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক।[২৪] এছাড়া মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের হাদীছ অনুধাবনে ব্যাপকভাবে আগ্রহী করা যায়। এভাবে ভার্চুয়াল ক্লাসরুম ও ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম হাদীছ পাঠদানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে।[২৫]

এক্ষেত্রে কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া যায়। যেমন–

১. ডিজিটাল হাদীছ লাইব্রেরী ও সফটওয়্যার : শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক ডিজিটাল হাদীছ লাইব্রেরী (যেমন: মাকতাবাতুশ শামেলা, জাওয়ামিউল কালিম) এবং হাদীছ সফটওয়্যার ব্যবহারের যথাযথ প্রশিক্ষণ দেওয়া। এর মাধ্যমে তারা অতি সহজে হাদীছ অনুসন্ধান, সনদ যাচাই এবং ব্যাখ্যা দেখতে পারবে।[২৬]

২. অনলাইন কোর্স ও লেকচার : অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের উচ্চমানের অনলাইন লেকচার, কোর্স, সেমিনার এবং ওয়েবিনার আয়োজন করা। দূরবর্তী শিক্ষার্থীরাও এর মাধ্যমে উপকৃত হ'তে পারবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহে এগুলোর সরাসরি সম্প্রচার করা যেতে পারে।

৩. মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন : হাদীছের ব্যাখ্যা, শানে উরূদ (বর্ণনার প্রেক্ষাপট) এবং প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো ভিডিও, অ্যানিমেশন, ইনফোগ্রাফিক্স এবং অন্যান্য মাল্টিমিডিয়া উপাদানের মাধ্যমে উপস্থাপন করা।

৪. শিক্ষামূলক অ্যাপ : হাদীছের বিষয়বস্তু নিয়ে শিক্ষামূলক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন বা ইন্টার‍্যাক্টিভ কুইজ তৈরি করা, যা শিক্ষার্থীদেরকে মজাদার উপায়ে শিখতে সাহায্য করবে।

৫. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডেটা এনালিটিক্স (Artificial Intelligence and Data Analytics)-এর ব্যবহার : বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সফটওয়্যারের আবিস্কার শিক্ষা ও অধ্যয়নকে একেবারেই সহজসাধ্য করে দিয়েছে। অতএব শিক্ষার্থীদেরকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কার্যকর ব্যবহার শিক্ষা করতে হবে, যা তাদেরকে সময় থেকে এগিয়ে রাখবে।

বাস্তবায়নের সম্ভাবনা ও সুফারিশমালা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠদান আধুনিকীকরণের জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্ভাবনী পন্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধতা এবং প্রশাসনিক অনাগ্রহ বড় চ্যালেঞ্জ। তবে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরীক্ষামূলকভাবে এসব পদ্ধতি চালু করে ইতিবাচক ফলাফল পেয়েছে।[২৭] সকলের

19. Maspul, Kurniawan. Interdisciplinary Education with Islamic Principles: Nurturing Sustainable Minds for Islamic Educational Excellence. Vol. 2. No. 1, 2023). 10.37850/rihlah.v2i01.589.

20. Yaacob, S., & Embong, R. The concept of an integrated Islamic curriculum and its implications for contemporary Islamic schools. International Conference, Islamic Republic of Iran ((2008, February, p. 20–22). http://irep.iium.edu.my/id/eprint/2470.

21. Dr, Shariqa Nasreen & Others, Interdisciplinary Approaches to Islamic Education and Environmental Awareness (International Journal of the Universe and Humanity in Islamic Vision and Perspective, Vol. 1 No. 1, 2024).

22. Husni, H., & Bisri, H. Inclusivism and Exclusivism: Responses of Prospective Islamic Religious Teachers towards Islamic Sects. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, (2024, 80(1), 1–8. https://doi.org/10.4102/hts.v80i1.9361.

23. Latifah Abdul Majid & others, Exploring Innovations and Challenges in The Study of Hadith in The Digital Era, p. 1048.

২৪. Zulkipli, S. N. & others, Takhrij al-Hadith via websites: A study of al-Durar al-Saniyyah, Mawqi' al-Islam, and Islamweb, International Journal of Science and Research, (2017, Vol. 73 (4), P. 83-100.

২৫. Ismail, Z., & Alas, Y. Integration of Information and Communication Technology (ICT) in Islamic Education: A Review on Its Challenges and Opportunities. Journal of Islamic Studies and Culture (2017), 27.

২৬. Fadlan Mohd Othman & others, The Use of Technology in Hadith Pedagogy, International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, (2024, vol. 13, no. 2), P. 27.

২৭. এই পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাজশাহী থেকে পরিচালিত হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর মাধ্যমে 'তাখাছ্ছুছ ফিল হাদীছ ওয়াল

সহায়তা ও আন্তরিকতা নিশ্চিত করা গেলে এসব পদ্ধতি বৃহত্তর পরিসরে বাস্তবায়ন সম্ভব। নিম্নে বাংলাদেশে হাদীছ পাঠদান পদ্ধতির আধুনিকায়নে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জসমূহ মুকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সুফারিশমালা উপস্থাপন করা হ'ল–

(১) নীতিগত সংস্কার ও পাঠ্যক্রম আধুনিকীকরণ :

হাদীছ পাঠদান আধুনিকীকরণের জন্য সবচেয়ে বড় কর্তব্য হ'ল, আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম মানসম্মত ও যুগোপযোগী করা। নতুন হাদীছ পাঠ্যক্রমে সিলেবাস বা পাঠ্যক্রমকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন তাতে প্রচলিত নিয়মে ঢালাওভাবে হাদীছ পাঠদান না করে হাদীছের বিষয়বস্তু ভিত্তিক পাঠদান (الحديث الموضوعي) করা হয় এবং তাতে মৌলিক বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সেই সাথে হাদীছ ভিত্তিক পাঠদান (الحديث التحليلي)-এর মাধ্যমে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা ও সমস্যা সমাধানের উপর জোর দেওয়া হয়। এতে ধারাবাহিক অধ্যয়নের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের জন্য হাদীছের গভীর উপলব্ধি এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তার বাস্তবভিত্তিক অনুশীলন সহজ হবে।[২৮]

(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং বেসরকারী শিক্ষা বোর্ডের ভূমিকা :

বাংলাদেশ সরকার উচ্চশিক্ষার জন্য প্রণীত কৌশলগত পরিকল্পনা (SPHE 2018-2030) উচ্চশিক্ষাকে বৈশ্বিক মানে উন্নীত করতে চায়, যেখানে শক্তিশালী আইসিটি ফোকাস এবং শিক্ষাবিজ্ঞান প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনায় ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নীতিগত নির্দেশিকা প্রণয়নের কথা বলা হয়েছে, যার লক্ষ্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।[২৯] এই পরিকল্পনার সাথে একীভূত হয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারীভাবে হাদীছ শিক্ষায় উদ্ভাবনী গবেষণার সুযোগ তৈরী করতে পারে। এছাড়া কওমী মাদ্রাসা ভিত্তিক বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, আহলেহাদীছ মাদ্রাসা ভিত্তিক আহলেহাদীছ তা'লীমী বোর্ড, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড প্রভৃতি বেসরকারী বোর্ড নিজস্ব পাঠ্যক্রম, সিলেবাস, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল পদ্ধতি আয়ত্ত করার মাধ্যমে হাদীছ পাঠদান পদ্ধতির আধুনিকীকরণ করতে পারে। এই উদ্যোগগুলো মাদ্রাসাশিক্ষার নির্দিষ্ট শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য তৈরী করা হ'লে, তা হাদীছ শিক্ষাকে জাতীয় শিক্ষা লক্ষ্যমাত্রার সাথে একীভূত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ খুলে দেবে।

(৩) এনজিও ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা :

বাংলাদেশে এনজিওগুলো শিক্ষা খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এজন্য বিশেষত ইসলামী ঘরানার এনজিওগুলো এবং বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ, আহলেহাদীছ তা'লীমী বোর্ড, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ডের মতো বিশেষায়িত বোর্ডগুলো হাদীছ পাঠদানে উদ্ভাবক এবং অনুঘটক হিসাবে কাজ করতে পারে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ফলপ্রসূ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে। সরকারী নীতি একটি সামগ্রিক কাঠামো এবং সংস্থান সরবরাহ করলেও বিশেষায়িত শিক্ষা বোর্ড এবং গতিশীল এনজিওগুলো হাদীছ শিক্ষার উদ্ভাবনী পদ্ধতিগুলো তৈরী ও বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে যেখানে মূলধারার শিক্ষা সরাসরি ধর্মীয় বিষয়গুলি মোকাবেলা করে না বা যেখানে কওমী ও ঐতিহ্যবাহী মাদ্রাসাগুলি সরাসরি সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাইরে কাজ করে, সেক্ষেত্রে এসকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি বা মেধাবৃত্তির ব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।[৩০]

(৪) শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পেশাগত উন্নয়ন :

মুহাদ্দিছ বা হাদীছ শিক্ষকদের জন্য আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি (সক্রিয় শিখন, সমালোচনামূলক চিন্তা-ভাবনা, পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার)-এর উপর ব্যাপক শিক্ষাবিজ্ঞান প্রশিক্ষণ প্রদান করা উচিৎ। এজন্য বিশেষ কিছু পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। যেমন- (১) হাদীছ শিক্ষাবিজ্ঞানের জন্য বিশেষায়িত প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা। (২) শিক্ষকদের জন্য ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন কর্মসূচি এবং মেন্টরশিপের ব্যবস্থা করা। (৩) শিক্ষক নেতৃত্বের সমস্যা এবং মানসিক সন্তুষ্টির অভাব মোকাবেলা করে একটি ইতিবাচক শিক্ষণ পরিবেশ গড়ে তোলা। (৪) শিক্ষকদের শিক্ষাবিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য উৎসাহিত করা এবং নতুন শিক্ষকদের জন্য বাধ্যতামূলক ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা।

(৫) প্রযুক্তিগত অবকাঠামো ও ডিজিটাল সাক্ষরতা বৃদ্ধি :

মাদ্রাসাগুলোতে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল অবকাঠামো (গ্রন্থাগার, ল্যাব, ইন্টারনেট প্রবেশাধিকার) নিশ্চিত করা যরূরী। এছাড়া অনলাইন শিখন প্ল্যাটফর্ম তৈরি ও প্রচার করা, প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য ডিজিটাল সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নিতে হবে।

ফিকহ' বিভাগ খোলা হয়েছে এবং ইতিমধ্যে হাদীছ পাঠদান পদ্ধতি আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বি. দ্র. www.hfeb.net

২৮. *Abdul Rohman & others, Challenges in Islamic Education Curriculum Development: A Comparative Study of Indonesia, Pakistan, and India, International Journal of Learning, Teaching and Educational Research (Vol. 23, No. 6, June 2024), p. 504-523. https://doi.org/10.26803/ijlter.23.6.23*

২৯. *Strategic plan for higher education in bangladesh; 2018-2030, accessed June 10, 2025, https://ugc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ugc.portal.gov.bd/publications/c768558c_2126_41c5_83ab_4a17004eb1af/2020-10-20-10-45-e20b0b095947032e58b70c32314be187.pdf*

৩০. *Rustam ependi, Solution to islamic education problems transitive islamic perspective, International journal of creative research thoughts (ijcrt), www.ijcrt.org, volume 8, issue 11, november 2020, p. 730–738.*

(৬) গবেষণা ও উন্নয়ন :

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে[৩১] হাদীছ শিক্ষার উপর একাডেমিক গবেষণা উৎসাহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো থেকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উদ্ভাবনী হাদীছ শিক্ষণ পদ্ধতির পাইলট প্রোগ্রাম এবং কেস স্টাডিগুলোর জন্য তহবিল সরবরাহ করা যেতে পারে। এছাড়া আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির সাথে হাদীছের মূল্যবোধের একীকরণ নিয়ে গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

উপসংহার : আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় হাদীছ পাঠের গুণগত মান উন্নয়নে উদ্ভাবনী পন্থার প্রয়োগ সময়ের দাবী। এজন্য গবেষণাধর্মী পাঠদান, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য হাদীছ পাঠকে অধিকতর ফলপ্রসূ করতে হবে। সরকার ও বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম আধুনিকায়ন এবং গবেষণায় সহায়তা প্রদান করতে হবে। এর মাধ্যমে হাদীছ শিক্ষাকে এমনভাবে আধুনিকীকরণ করা উচিত যাতে কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় জ্ঞানের গভীরতার পাশাপাশি সমসাময়িক দক্ষতা অর্জন করে, যা তাদেরকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গড়ে তোলে। সর্বোপরি এই প্রবন্ধের আলোকে বলা যায়, বাংলাদেশে হাদীছ পাঠদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হ'লে আমাদের চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তব প্রয়োগ এই তিনটির সম্মিলন প্রয়োজন। সেই সাথে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সকল অংশীজনের (শিক্ষক, শিক্ষার্থী, নীতিনির্ধারক, অভিভাবক এবং গবেষক) সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য।

৩১. *Teaching-Learning Practices in Higher Education: An Exploratory Study at University Level in Bangladesh, accessed June 10, 2025, https://naem.portal.gov.bd/sites/default/files/files/naem.portal.gov.bd/page/c9f704e0_25bf_487f_bfc2_c3d091445df4/2021-09-15-05-43-0358c444d70146f2ca3de94c8bb1307f.pdf*

খলিসুন প্রোডাক্টস

Khalisun Products

বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত

- বিশুদ্ধ মরিচ গুড়া-৫২০ Tk/Kg
- হলুদ গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ধনিয়া গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ভাজা ধনিয়া গুড়া-৫০০ Tk/Kg
- ভাজা জিরা গুড়া-১৫০০ Tk/Kg

- হোম মেড
- পরিষ্কার ও বাছাই করা মরিচ
- হলুদ ধুয়ে শুকিয়ে তৈরি করা
- রং ও কেমিক্যাল মুক্ত
- দেশী মরিচ, হলুদ ও ধনিয়া
- ১০০% খাঁটি ও অথেন্টিক
- ধনিয়া/জিরা ধুয়ে শুকিয়ে ভেজে গুড়া করা
- গরম মসলা গুড়া
- শাহী গরম মসলা গুড়া

বি: দ্র: অর্ডার মোতাবেক তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।

SCAN ME

বিসিক নিবন্ধন নং : RA-20251109-0022719

যোগাযোগ : (ছায়ানীড় আবাসিক এলাকা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৩৩৯-৯৮৬৮৪৮ Khalisun Products

হালাল পয়েন্ট বিডি

নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরি ১০০% খাঁটি পণ্যের নিশ্চয়তা

আমাদের পণ্যসমূহ

- সরিষার তৈল
- আখের গুড়
- হোম মেড ঘি
- ১০০% খাঁটি খেজুরের গুড়
- ১০০% খাঁটি আখের গুড়
- প্রাকৃতিক চাকের খাঁটি মধু
- হাতে তৈরি গমের আটার সেমাই
- খাঁটি খেজুর গুড় (ঝোলা, পাটালি, দানাদার ও বিচ গুড়)
- ফরমালিন মুক্ত সকল ধরনের আম ও লিচু ইত্যাদি।

বি.দ্র. দেশের যেকোন স্থানে খুচরা ও পাইকারী সরবরাহ করা হয়।

সার্বিক যোগাযোগ

প্রোঃ খুরশেদ আলম
মোবাইল : ০১৭৫১৪৭৫৩৬২
বানেশ্বর, পুঠিয়া, রাজশাহী

facebook.com/khurshad.rony
Facebook Page : হালাল পয়েন্ট বিডি
E-mail : khurshadrony607@gmail.com
Whatsapp : 01863024259

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড' পবিত্র কুরআন ও হাদীছ ভিত্তিক সুশৃংখল ও পরিকল্পিত শিক্ষা আন্দোলন পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারী ও সমন্বয়কারী শিক্ষা বোর্ড। এর মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

(১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে শিক্ষার বিস্তার ঘটানো এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় সুশিক্ষিত মেধাবী ও ইখলাছপূর্ণ যোগ্য আলেম ও দাঈ ইলাল্লাহ তৈরী করা এবং যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা।
(২) শিরক-বিদ'আত ও বাতিল আক্বীদা ও আমল থেকে মুসলিম উম্মাহকে রক্ষা করা এবং সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুযায়ী ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ময়দানে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উপযুক্ত কারিকুলাম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।
(৩) শিক্ষার সকল স্তরে শুদ্ধভাবে কুরআন পঠন ও অনুধাবনের ব্যবস্থা করা এবং এর সাথে বাংলা, ইংরেজী, আরবী, উর্দূ ভাষাসহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটানো।
(৪) উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে দক্ষতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

আপনার প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত করতে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করুন!

বোর্ড-এর কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে ব্রাউজ করুন- www.hfeb.net

সার্বিক যোগাযোগ : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭৩০-৭৫২০৫০, ০১৭২৬ ৩১৫৯৭০, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭, ই-মেইল : hf.eduboard@gmail.com, Fb page : /hf.education.board

আধুনিক সমাজে তাওহীদী চেতনার গুরুত্ব

*- আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন**

ভূমিকা : বর্তমান বিশ্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম শিখরে আরোহণ করলেও মানুষের আত্মিক প্রশান্তির পারদ ক্রমশ নিম্নমুখী। আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা আমাদের দিয়েছে অঢেল আরাম-আয়েশ আর বিলাসিতার উপকরণ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে মনের গভীরের সুখ ও স্থিতি। মানুষ আজ অর্থের পেছনে ছুটতে ছুটতে নিজেকে হারিয়ে ফেলছে হতাশা, অস্থিরতা আর অন্তহীন চাহিদার অতল গহ্বরে। বাহ্যিক চাকচিক্যের এই মরিচিকার পেছনে ছুটতে গিয়ে মানুষ ভুলে যাচ্ছে তার সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য। ‘তাওহীদী চেতনা’ বা মহান আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস কেবল একটি ধর্মীয় অনুষঙ্গ নয়, বরং এটি মানবজীবনের দিশারী ও মুক্তির একমাত্র সনদ।

তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদ হ’ল ইসলামের মূল ভিত্তি এবং পঞ্চস্তম্ভের মূল স্তম্ভ। আদি পিতা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল এই এক মহাসত্যের দিকেই মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশ’ বছর আগে মক্কার ঘুণেধরা ও পুঁতিগন্ধময় সমাজে বিশ্বনবী (ছাঃ) যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর মশাল নিয়ে আবির্ভূত হ’লেন, তখন সেই জাহেলী সমাজ আমূল পরিবর্তিত হয়ে এক শান্তিময় জনপদে পরিণত হয়েছিল। মানুষ মানুষের গোলামী ছেড়ে এক আল্লাহ্র দাসত্বের অধীনে খুঁজে পেয়েছিল প্রকৃত মানবাধিকার ও মর্যাদা।

তাওহীদ মানুষকে হাযারো মিথ্যা প্রভুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক মহান সত্তার কাছে সমর্পিত করে। এটি এমন এক বিপ্লবী চেতনা, যা ভোগবাদী সমাজের মোহ কাটিয়ে মানুষকে শেখায় আত্মমর্যাদা, পরিমিতিবোধ এবং প্রকৃত সাফল্যের সংজ্ঞা। আধুনিক এই যান্ত্রিক ও সংঘাতময় জীবনে তাওহীদী চেতনার সেই অপরিহার্য গুরুত্ব ও প্রভাব নিয়েই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

শিরক থেকে মুক্তি লাভ : তাওহীদের বিপরীত হ’ল শিরক। আল্লাহ্র একত্বের সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থাপণ করাকে শিরক বলা হয়। আজকে অধিকাংশ মানুষ ধর্মীয় ও বৈষয়িক বিষয়ে নানাবিধ শিরকে লিপ্ত। কেউ আছেন যেখানে সেখানে নিজের উন্নত মস্তক অবনত করছেন। কেউ গরুর পূজা করছে। গরুর মল-মূত্র পান করছে। এমনকি একটা তুলসী গাছের পর্যন্ত পূজা করছে! অন্যদিকে অধিকাংশ মুসলিমরা ঈমান আনার পরেও শিরকে লিপ্ত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ‘তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে। অথচ তারা শিরক করে’ *(ইউসূফ ১২/১০৬)*। মানুষ আজকাল মসজিদেও সিজদা করেন আবার মাযারে গিয়েও সিজদা করেন। পীরের কাছে সন্তান কামনা করেন, নযর-নেওয়াজ দেন, বিপদে-আপদে মুক্তি চান। রাজনৈতিক নেতারা অধিকাংশের মতামতের দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র বিধানকে অগ্রাহ্য করে নিজেদের মনমত আইনে ও বিভিন্ন মানবরচিত মতবাদ দিয়ে দেশ পরিচালনা করেন। দেশীয় সংস্কৃতির নামে চলছে স্থানপূজা, খাম্বাপূজা, শিখা অনির্বাণ, শিখা চিরন্তন প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় শিরক। অথচ তারা সকলেই মুসলমান! এই দ্বিচারিচার মূল কারণ নির্ভেজাল তাওহীদ সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকা।

এর বিপরীতে তাওহীদের মূল শিক্ষা হ’ল- মানুষ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে মাথা নত করবে না, মানুষ একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করবে, কারো উপকার ও ক্ষতি করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ্র কাছে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই বিধানদাতা। তাই একজন দৃঢ় তাওহীদবাদী মানুষ কখনো শিরকে জড়াতে পারে না। শুধুমাত্র নির্ভেজাল তাওহীদ বিশ্বাসই মানুষকে শিরকের মহাপাপ থেকে রক্ষা করতে পারে।

দাসত্ব থেকে মুক্তি : আধুনিক যুগে মানুষ বাহ্যিকভাবে স্বাধীন মনে হ’লেও তারা নানামুখী অদৃশ্য শিকলে বন্দী। সূদী অর্থনীতি, বিজাতীয় রাজনীতি, অমুসলিমদের ফ্যাশন, সোশ্যাল মিডিয়া ট্রেন্ড বা নিজের প্রবৃত্তির দাসত্ব মানুষকে গ্রাস করে রেখেছে। মুসলিম বিশ্বের ৫৭টি রাষ্ট্র কার্যত উপরোক্ত দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী হয়ে আছে। উন্নত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অর্থ ইহূদী ব্যাংকগুলোতে জমা হয়ে আছে, অন্যদিকে গরীব রাষ্ট্রগুলো তাদের ঋণের জালে আটকা পড়েছে। ফলে মুসলিম বিশ্ব ইহূদী-খৃষ্টানদের কাছে কার্যত অর্থনৈতিকভাবে জিম্মি হয়ে আছে। তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতাও আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তাদের দেওয়া রাজনীতি সকল মুসলিম রাষ্ট্রে মহা শোরগোলে পূজিত হচ্ছে উদার বহুদলীয় গণতন্ত্রের নামে। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে যুগের পর যুগ। আধুনিক প্রযুক্তির বদৌলতে পশ্চিমা সংস্কৃতি আজ আমাদেরকে অষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণের মূল চাবিকাঠি ইহূদী-খ্রিষ্টানদের হাতেই। তাদের দেওয়া মতবাদে পরিচালিত হয়ে ভাই-ভাই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছি। মজার বিষয় তাদের নিকট ঋণ নিয়ে তাদের কাছ থেকেই অস্ত্র কিনছে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো। ফলে মরছে মুসলমান, মারছেও মুসলমান। দূর থেকে শয়তানী হাসির ঝলক দিচ্ছে ইহূদী-খৃষ্টান লবিরা।

এই বস্তুগত ও মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র সেই বৈপ্লবিক আহবানে ফিরে যেতে হবে। সব গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে এক আল্লাহ্র দাসত্বে নিজেদের আবদ্ধ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ‘তাদেরকে এ ছাড়া অন্য কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ্র ইবাদত করবে খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে’ *(বাইয়িনাহ ৯৮/৫)*। মূলত এক আল্লাহ্র দাসত্বই অন্য সকল দাসত্ব থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়। আল্লামা ইকবালের ভাষায়-

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

‘এই একটি সিজদা, যাকে তুমি কঠিন মনে করো,

**শিক্ষার্থী, মাদরাসা দারুল হাদীছ আস-সালাফিইয়াহ, পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।*

তোমাকে হাযারো মানুষের দুয়ারে সিজদা করা থেকে মুক্তি দেয়'।

জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ : দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং বস্তুবাদী বিশ্বে আমরা অনেকেই জীবনের প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেতে বিভ্রান্ত হই। নিরন্তন পরীক্ষার এক জীবনে আমরা কত বিপদ-আপদ, দুঃখে-কষ্টে ও সংকট মুহূর্তে পতিত হই। এই কঠিন সময়ে আল্লাহ্র উপর অটুট বিশ্বাস আমাদেরকে লক্ষ্যে দৃঢ় থাকতে সাহায্য করে। এজন্য আমাদের জীবনের লক্ষ্য হবে একমাত্র আল্লাহ্র দাসত্ব করা এবং উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 'আর আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবলমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*। তিনি আরো বলেন, وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 'মুমিন পুরুষ ও নারীদের প্রতি আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং ওয়াদা করেছেন 'আদন' নামক জান্নাতের উত্তম বাসস্থান সমূহের। আর আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সামান্য সন্তুষ্টিই হ'ল সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আর সেটাই হ'ল মহান সফলতা' *(তওবা ৯/৭২)*। উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে জীবনের সঙ্গী বানিয়ে নিতে পারলে দুনিয়াবী কোন ধোঁকা ও শয়তানী কুমন্ত্রণা মানুষকে জান্নাতী পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না।

মানসিক প্রশান্তি ও হতাশা থেকে মুক্তি : অনাগত ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকে মানুষের মনে দুশ্চিন্তা ও হতাশার সৃষ্টি হয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর আগে মানুষের তাক্বদীর সৃষ্টি করেছেন। তাঁর জন্ম-মৃত্যু, রিযিক ও সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগ্যা সবকিছুই পূর্ব নির্ধারিত।[১] এই জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত কারো জানা নেই। এজন্য বান্দাকে আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা ও আশাবাদী হয়ে কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

বান্দা যখন বিশ্বাস করবে একমাত্র আল্লাহই রিযিকদাতা, আরোগ্যদাতা, উত্তম সাহায্যকারী, বিপদে মুক্তিদানকারী, তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি হও বললেই হয়ে যায়; তখন আল্লাহ্র প্রতি মানুষের ভরসা বৃদ্ধি পায়। তিনি যদি বান্দার কল্যাণ চান তাহ'লে পৃথিবীর কোন শক্তিই তা রোধ করতে পারে না এবং তিনি বান্দার অকল্যাণ চাইলে পৃথিবীর কোন কিছুই তা ঠেকাতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি কোন কিছু চাইলে আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে। যখন কোন সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে। জেনে রেখ! যদি সমস্ত মাখলূক একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবুও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন সেটা ছাড়া তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। অপরদিকে সমস্ত সৃষ্টি একত্রিত হয়ে যদি তোমার কোন ক্ষতি করতে চায়, তবুও আল্লাহ তোমার ভাগ্যে যতটুকু লিখে রেখেছেন ততটুকু ব্যতীত তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[২]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا 'আর তিনি তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক প্রদান করে থাকেন। বস্তুতঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার আদেশ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর জন্য পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন' *(তালাক্ব ৬৫/৩)*।

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্র উপর ভরসা মানুষকে অহেতুক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত রাখে এবং চরম বিপদেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়া থেকে রক্ষা করে। একনিষ্ঠ তাওহীদ বিশ্বাস তাই মানুষের সকল পেরেশানী ও হতাশার মহৌষধ।

নৈতিকতার ভিত্তি ও অপরাধ দমন : আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস মানুষের নৈতিকতার ভিত্তিকে শক্তিশালী করে। জাহেলী আরবে পাপাচারে লিপ্ত জনগণ তাওহীদ বিশ্বাসের বদৌলতে এমন এক সভ্য ও উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছিল যে, পরবর্তীতে নৈতিকতার বলে তারাই বিশ্ব শাসন করেছিলেন। এর মূল চালিকা শক্তি ছিল তাদের নৈতিক উৎকর্ষতা; আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও জিহাদী জাযবা। বেলাল, ইবনে মাসঊদ, খাব্বাব ইবনে আরাত (রাঃ)-এর মত ছাহাবীরা তাওহীদের উপর ঈমান আনার কারণে দুনিয়া ও আখেরাতে মহা সম্মানিত হয়েছিলেন। যারা একদিন আগেও মদের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল তারাই মদ হারামের সাথে সাথেই নিজেদের তৈরী মদ মদীনায় ফেলে দিয়েছিল। সেদিন মদীনার অলিতে-গলিতে ফেলে দেওয়া মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। সূদের মত জঘন্য ও আকর্ষণীয় বস্তুকে ছাড়তে তাদের দশবার ভাবতে হয়নি। একজন গামেদী মহিলা নিজের অপরাধ স্বীকার করে দুনিয়ার শাস্তিকে মেনে নিয়ে আল্লাহ্র ক্ষমা ও নাজাতের পথ বেছে নিয়েছিল। এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ ইসলামের ইতিহাসে মজুত রয়েছে। এই উন্নত নৈতিক সমাজ ব্যবস্থা আমরা বহু শতাব্দী দেখতে পাইনি। কেন এই নৈতিক উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল? জবাবে উত্তর আসবে আসবে; আর তা হ'ল নির্ভেজাল তাওহীদের উপর অটুট থাকা।

আধুনিক বিশ্ব ব্যবস্থা নৈতিকভাবে এতই ভঙ্গুর হয়ে পড়েছে যে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে অপরাধপ্রবণ কর্মকান্ড স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এখন ছেলের হাতে বাবার খুন হওয়ার ঘটনা আমাদের কাছে আর দশটা নিউজের মতই সাধারণ মনে হয়। সুদ-ঘুষকে মানুষ ভদ্রবেশী ফ্যাশন মনে করছে। সেকারণ সাবেক প্রধানমন্ত্রীর পিয়নের ৪০০ কোটি টাকার

---

১. *রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেরই জন্ম হয় এভাবে যে, তার মায়ের পেটে শুক্ররূপে চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকে। ... তিনি আল্লাহর হুকুমে তার তাক্বদীরে লিখে দেন- (১) তার আমল (২) তার মৃত্যু, (৩) তার রিযিক এবং (৪) তার নেককার বা দুর্ভাগা হওয়ার বিষয়। তারপর তন্মধ্যে রূহ প্রবেশ করান (বুখারী হা/৩২০৮; মিশকাত হা/৮২)।*

২. *তিরমিযী হা/২৫১৬; মিশকাত হা/৫৩০২।*

মালিক হওয়ার বিষয়টি তিনি জাতির সামনে অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই উপস্থাপন করেছিলেন।

সিসি ক্যামেরা ফাঁকি দিয়ে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতি করা খুবই সহজ। ক্ষমতার অপব্যবহার করে অন্যের হক্ব নষ্ট করা মামুলী কাজ। কিন্তু বান্দা যখন জানবে একজন মহান রব তাঁর সকল কর্মকাণ্ড সর্বদা পর্যবেক্ষণ করছেন *(হুজুরাত ৪৯/১৮)*, ক্বিয়ামতের দিন তাকে অনুপরিমাণ ভালো-মন্দের হিসাব দিতে হবে *(যিলযাল ৯৯/৭-৮)*; তখন দুনিয়ার কোন সম্পদের লালসা তাকে অপরাধ ও দুর্নীতিতে জড়াতে পারবে না। তাই বর্তমান যুগের নীতি-নৈতিকতার অধঃপতন ও অপরাধ প্রবনতা হ্রাস করতে জনগণের মধ্যে তাওহীদি চেতনা বৃদ্ধি করার কোন বিকল্প নেই।

ভীতির বদলে সাহস লাভ : সত্যের আওয়াজকে নিস্তব্ধ করার জন্য যুগে যুগে ক্ষমতাশীলরা মানুষের মনে ভীতি ঢুকানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা চালান। পক্ষান্তরে তাওহীদের সেবকরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করেন এবং সকল বাধাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে চলেন। দুনিয়াবী কোন শক্তিকেই তারা ভয় করেন না। লোকভয়, রাজভয়, রুজি-রুটির ভয়, সমাজের ভয়, সংখ্যাধিক্যের ভয়; কোন ভয়ই তাদেরকে দমাতে পারে না। আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ‘নিশ্চয়ই যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর তার উপর দৃঢ় থাকে, তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী নাযিল হয় এবং বলে যে, তোমরা ভয় পেয়ো না ও চিন্তান্বিত হয়ো না। আর তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে’ *(হা-মিম সাজদাহ ৪১/৩০)*।

তালুত মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে জালুতের বিশাল সুসজ্জিত শক্তিশালী বহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন, كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ‘কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাজিত করেছে আল্লাহ্র হুকুমে! বস্তুতঃ আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ২/২৪৯)*।

মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনের বাহিনীর সামনে পড়েছিলেন এবং পালানোর কোন পথ ছিল না, তখন সে মুহূর্তে তিনি বলেছিলেন, فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (٦١) قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ‘এরপর যখন উভয় দল পরস্পরকে দেখতে পেল, তখন মূসার সাথীরা বলে উঠল, আমরা তো অবশ্যই ধরা পড়ে গেলাম! মূসা বলল, কখনোই না। আমার সাথে আমার প্রতিপালক আছেন। তিনি অবশ্যই আমাকে পথ দেখাবেন’ *(শো‘আরা ৬১-৬২)*। অতঃপর ফেরাউনের কবল থেকে মূসার কওম নাযাত পেল।

একইভাবে বদর যুদ্ধের দিন রাসূল (ছাঃ) অস্ত্রে-সস্ত্রে সুসজ্জিত মক্কার কুরাইশ বাহিনীর সামনে দীনহীন-দুর্বল মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে নেমেছিলেন। এসময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে আকুতি জানিয়ে দো‘আ করেছিলেন, اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِى مَا وَعَدْتَنِى اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ...اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ لاَ تُعْبَدْ فِى الأَرْضِ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا– ‘হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যে ওয়াদা করেছ তা পূর্ণ কর। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার অঙ্গীকার ও ওয়াদা পূরণের প্রার্থনা জানাচ্ছি। ... হে আল্লাহ! যদি এই ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহ’লে আজকের দিনের পর তোমার ইবাদত করার মত আর কেউ যমীনে আর থাকবে না’।[৩]

বেলাল (রাঃ)-কে উত্তপ্ত কংকর-বালুর উপরে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে বুকে পাথর চাপা দেওয়া হ’ত আর বলা হ’ত لاَ تَزَالُ هَكَذَا حَتَّى تَمُوتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ وَتَعْبُدَ اللاَّتَ وَالْعُزَّى ‘মুহাম্মাদের দ্বীন পরিত্যাগ এবং লাত-‘উযযার পূজা না করা পর্যন্ত তোকে আমৃত্যু এভাবেই পড়ে থাকতে হবে’। কিন্তু বেলাল শুধুই বলতেন ‘আহাদ’ ‘আহাদ’।[৪]

যুগে যুগে এভাবেই তাওহীদবাদীরা বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সাথে লড়াই করে থাকেন। বস্তুত এক আল্লাহ্র ভয়, মানুষকে সকল ভয় থেকে মুক্তি দেয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ ‘মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় করো’ *(মায়েদা ৫/৪৪)*।

ভ্রান্ত মতবাদ ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি লাভ : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরবের শতধাবিভক্ত সমাজ ও অসংখ্য জাহেলিয়াতের জঞ্জালকে দূর করে তাওহীদী সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। এর ফলে তাকে অসংখ্য অপবাদ ও যুলুমের সম্মুখীন হ’তে হয়েছিলো। এযুগেও মানুষ জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, গনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ, মানবতাবাদ প্রভৃতি মতবাদ দ্বারা শোষিত হচ্ছে এবং মানুষ মানুষের দাসত্ব করছে। মানুষের মস্তিস্কপ্রসূত মতবাদগুলোর মধ্যে ভুল ও দ্বন্দ থাকা স্বাভাবিক। এর ফলে দলাদলি ও বিভক্তি সৃষ্টি অনিবার্য হয়ে পড়ে। অন্যদিকে একাধিক মতবাদ, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও বহু ইলাহ্র আনুগত্যের জঞ্জাল থেকে বেরিয়ে এক আল্লাহ্র বিধানের কাছে মাথা নত করলে ঐক্য ও সংহতি দৃঢ় থাকে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ব্যতীত বহু উপাস্য থাকত, তাহ’লে উভয়টিই ধ্বংস হয়ে যেত’ *(আম্বিয়া ২১/২২)*।

আল্লাহ্র একত্বের প্রতি বিশ্বাস সমাজের প্রচলিত রীতি-রীতি, দেশাচার ও কুসংস্কারের প্রতি অন্ধবিশ্বাস থেকে মানুষকে রক্ষা করে। তাওহীদের মৌলিক শিক্ষা মানুষকে অন্ধভাবে কোন কিছু গ্রহণ না করে, যাচাই-বাছাই করে সত্য গ্রহণ করতে শেখায়। এটি কুসংস্কার ও ভ্রান্ত মতবাদের ভিত্তি দুর্বল করে দেয়। কারণ কুসংস্কার প্রায়শই মিথ্যা ও যুক্তিহীন বিশ্বাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। সমাজে প্রচলিত পীর,

---

৩. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (৩য় মুদ্রণ), পৃ. ৩০০।
৪. ইবনু হিশাম ১/৩১৭-১৮, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) (৩য় মুদ্রণ), পৃ. ১৪২।

আউলিয়া, গাউছ, কুতুব, গণক, ওঝা-ফকির, প্রকৃতি ইত্যাদিকে উপাস্য বা বিপদ থেকে রক্ষাকারী মনে করার ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্তি দেয় তাওহীদ বিশ্বাস। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'আর তুমি আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে আহবান করো না, যে তোমার কোন উপকার করতে পারে না বা কোন ক্ষতি করতে পারে না। যদি তুমি এরূপ কর, তাহ'লে তখন তুমি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোন কষ্টে নিপতিত করেন, তবে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেউ নেই। আর যদি তিনি তোমার কোন কল্যাণ করতে চান, তবে তার অনুগ্রহকে ফিরিয়ে দেওয়ার কেউ নেই। স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী তিনি তা দান করেন। বস্তুতঃ তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ইউনুস ১০/১০৬-৭)*।

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাওহীদের চেতনা : আল্লাহ্র দেওয়া আলো-বাতাস যেমন সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর, তেমনি আল্লাহ্র দেওয়া বিধান ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণকর। তাই তাওহীদের বিশ্বাস যখন মানুষের হৃদয়ে প্রোথিত হয়, তখন সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা স্বাভাবিকভাবেই একটি ঈমানী দায়িত্বে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাক আল্লাহ্র জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসাবে, যদিও সেটি তোমাদের নিজেদের কিংবা তোমাদের পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়। (বাদী-বিবাদী) ধনী হৌক বা গরীব হৌক, আল্লাহ তাদের সর্বাধিক শুভাকাংখী। অতএব ন্যায়বিচারে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও, তবে জেনে রেখ আল্লাহ তোমাদের সকল কৃতকর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত'।

ক) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) : কুরায়েশ নেতা আবু জাহলের সম্ভ্রান্ত মাখযূম গোত্রের জনৈকা মহিলা চুরির আসামী হয়। তাকে বাঁচানোর জন্য নেতাদের পক্ষে নাতি উসামা বিন যায়েদকে দিয়ে সুফারিশ করানো হয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি আমার নিকট আল্লাহ্র দন্ডবিধির ব্যাপারে সুফারিশ করছ? অতঃপর তিনি খুৎবা দিয়ে বলেন, তোমাদের পূর্বেকার উম্মত ধ্বংস হয়েছে একারণে যে, যখন তাদের মধ্যেকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোন দুর্বল শ্রেণীর লোক চুরি করত, তখন তাকে দন্ড দিত। আল্লাহ্র কসম! যদি আজ মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত, আমি তার হাত কেটে দিতাম'।[৫]

খ) ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ): খলীফা ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন এবং তার পিঠে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হন। কিন্তু কিছু দূর যেতেই ঘোড়াটি খুঁড়িয়ে চলতে থাকে। তখন তিনি বিক্রেতার নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, তুমি ঘোড়াটি ফিরিয়ে নাও, কেননা এটি ক্রটিযুক্ত। বিক্রেতা বলল, আমি ঘোড়াটি ফেরত নেব না। খলীফা বললেন, তাহ'লে তোমার ও আমার মাঝে একজন বিচারক নির্ধারণ করা হোক। বিক্রেতা বলল, বেশ তাহ'লে শুরাইহ। খলীফা বললেন, তিনি কে? বিক্রেতা বলল, তিনি ইরাকের অধিবাসী।

অতঃপর তারা উভয়ে শুরাইহ্র নিকট গিয়ে সব ঘটনা বর্ণনা করলেন। শুরাইহ ঘোড়ার মালিকের বক্তব্য শুনে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যে অবস্থায় ঘোড়াটি নিয়েছিলেন সে অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে দিন। অথবা যা ক্রয় করেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকুন'। ওমর (রাঃ) বললেন, এটি ব্যতীত ন্যায়বিচার হ'তে পারে কি? আপনি কূফায় চলুন। আমি আপনাকে কূফার বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দিলাম।[৬]

এরকম ন্যায়বিচারের নমুনা শুধুমাত্র ইসলামের ইতিহাসেই দেখা মিলে। এর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করার কারণে। কিন্তু আধুনিক বিচার ব্যবস্থায় ইংরেজদের চালুকৃত বিলম্ব বিচার ব্যবস্থা বিচারহীনতার সংস্কৃতি চালু করেছে। যেখানে ন্যায়বিচার তো হয়না বরং নিরপরাধ মানুষরাই আজকে বেশী যুলুমের শিকার হচ্ছেন।

সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি : আল্লাহ্র একত্বের ঘোষণা মানুষকে শেখায় আমরা সকলেই এক আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং সকলেই এক আদমের সন্তান। আদম ছিলেন মাটির তৈরী। অতএব অহংকারী না হয়ে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করে ভাই ভাই হয়ে পৃথিবীতে বসবাস করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِأَعْجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا لِأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، 'হে মানুষ! জেনে রেখ, তোমাদের প্রভু একজন, তোমাদের পিতা একজন। সুতরাং আরবের উপর অনারবের, অনারবের উপর আরবের; সাদার উপর কালোর, কালোর উপর সাদার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তাক্বওয়ার ভিত্তিতে'।[৭]

উপসংহার : যুলুম ও অত্যাচারে নিমজ্জিত পৃথিবীতে মানুষের মানবিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কোন বিকল্প নেই। এজন্য আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাওহীদ বিমুখতা নয় বরং তাওহীদী চেতনার পুনর্জাগরণই একমাত্র সমাধান। তাই আসুন! আমরা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে তাওহীদের আলোয় সাজিয়ে তুলি। পরিশেষে আবারও সেই তাওহীদী কালেমা পাঠ করি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' -আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কোন সাহায্যকারীও নেই।

---

৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬১০।

৬. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৯/২৫ পৃ., ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন ১৫৮ পৃ.।

৭. বায়হাক্বী-শো'আব হা/৫১৩৭; আহমাদ হা/২৩৫৩৬; ছহীহাহ হা/২৭০০।

ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় করবেন যেভাবে

*-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৭. রিয়া ও লৌকিকতা পরিহার করা :

ইলম অর্জনের ক্লান্তিকর ও দীর্ঘ সফরে আমরা কতই না সময় ব্যয় করি! কত রাত জেগে কিতাবের পাতা উল্টাই, কত শত জ্ঞানীর কথা শুনি। কিন্তু এই সমস্ত জ্ঞান যখন আমলের রূপ নিতে যায়, তখন এক নীরব ঘাতক এসে তার সমস্ত সৌন্দর্যকে বিষাক্ত করে দিতে চায়। সেই ঘাতকের নাম 'রিয়া' বা লৌকিকতা। নেক আমলের এক ভয়ংকর শত্রু হ'ল রিয়া, যা ইলম ও আমলের মধ্যবর্তী সেতুকে ধ্বংস করে দেয়। আমরা যখন কোন ভালো কাজ করি- হ'তে পারে তা জ্ঞানগর্ভ আলোচনা, সুন্দর একটি বক্তৃতা, ছালাতের ধীরস্থিরতা ও দীর্ঘ সিজদা, কিংবা গোপনে দান-ছাদাক্বা, তখন আমাদের হৃদয়ের গভীরে একটি সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে, 'আহা! মানুষ যদি দেখত! যদি তারা আমার প্রশংসা করত! যদি তারা আমাকে 'বড় আলেম', 'বড় পরহেযগার' বা 'দানবীর' বলে চিনত! এই ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষাটিই হ'ল শয়তানের পাতানো এক ভয়ঙ্কর ফাঁদ। এই ফাঁদে পা দেওয়া মাত্রই আমাদের আমলের পাল্লাটি ওলটপালট হয়ে যায়। যে কাজটি হচ্ছিল মহান রবের জন্য, তা মুহূর্তেই হয়ে যায় নশ্বর মানুষের জন্য, যারা না পারে আমাদের কোন উপকার করতে, না পারে কোন ক্ষতি করতে।

এই আত্মপ্রবঞ্চনা দেখে অবাক হয়ে ইয়াহইয়া ইবনু মু'আয (মৃ. ২৫৮হি.) বলেন, عَجِبْتُ مِنْ ثَلَاثٍ: رَجُلٍ يُرَائِي بِعَمَلِهِ مَخْلُوقًا مِثْلَهُ، وَيَتْرُكُ أَنْ يَعْمَلَهُ لِلهِ. وَرَجُلٍ يَبْخَلُ بِمَالِهِ وَرَبُّهُ يَسْتَقْرِضُهُ مِنْهُ، فَلَا يُقْرِضُهُ مِنْهُ شَيْئًا. وَرَجُلٍ يَرْغَبُ فِي صُحْبَةِ الْمَخْلُوقِينَ وَمَوَدَّتِهِمْ، وَاللهُ يَدْعُوهُ إِلَى صُحْبَتِهِ وَمَوَدَّتِهِ، 'তিন শ্রেণীর মানুষকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই- (১) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্র জন্য আমল সম্পাদন পরিহার করে তার মতোই অপর সৃষ্টিকে দেখানোর জন্য আমল করে, (২) ঐ ব্যক্তি, যে তার সম্পদ আল্লাহ্র পথে ব্যয়ে কৃপণতা করে। আল্লাহ তার কাছে ঋণ চান, অথচ সে তাঁকে ঋণ দেয় না (৩) সেই ব্যক্তি, যে সৃষ্টিকূলের সাহচর্য ও ভালোবাসা লাভের জন্য উদগ্রীব থাকে, অথচ আল্লাহ তাঁর সান্নিধ্য ও ভালোবাসার দিকে তাকে আহ্বান করেন'।[1] বর্তমান যুগেও এই উক্তির বাস্তবতা চাক্ষুষ বিদ্যমান। আমরা অধিকাংশই এখন আল্লাহ্র সন্তুষ্টির পরিবর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইক, শেয়ার ও প্রশংসার আশায় নিজেদের ইবাদত, দান বা ভালো কাজ প্রদর্শন করে থাকি। যখন বিলাসিতা, অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা বা জমকালো অনুষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়, তখন মনে কোন কার্পণ্য থাকে না; উদার হস্তে খরচ করি। কিন্তু আমাদেরকে যখন আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য, মসজিদ নির্মাণ, গরীব-দুঃখীর সাহায্যে, কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হয়, তখনই অন্তরজুড়ে যনমের কৃপণতা জেঁকে বসে। নেককার মানুষের সাহচর্য, দ্বীনি বৈঠক, কুরআন ও যিক্রের মজলিসে আমাদের মন বসে না; অথচ দুনিয়াবী খ্যাতি, সামাজিক মর্যাদা এবং প্রভাবশালী মানুষের সাহচর্য ও তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা কতই না ব্যাকুল থাকি। মূলত ইখলাছের অভাবেই আমাদের আজ এই করুণ পরিণতি।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) ইখলাছ ও রিয়াকে হৃদয়ের দু'টি গাছের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন, 'ইখলাছ ও তাওহীদ হৃদয়ের একটি গাছের মত, আমল সমূহ যার শাখা-প্রশাখা। এর দুনিয়ার ফল হ'ল পবিত্র জীবন এবং আখেরাতে ফল হ'ল চিরস্থায়ী জান্নাত। জান্নাতের ফল-ফলাদি যেমন কখনো শেষ হবে না এবং নিষিদ্ধ হবে না। তাওহীদ ও ইখলাছের ফলাফলও ঠিক সেই রকমই হবে। আর মিথ্যা ও লৌকিকতাও হৃদয়ের একটি গাছের মত, দুনিয়াতে তার ফল হ'ল ভয়, দুশ্চিন্তা, পেরেশানি এবং হৃদয়ের সংকীর্ণতা ও অন্ধকার। আর আখেরাতে এর ফল হ'ল যাক্কূম ও চিরস্থায়ী আযাব। মহান আল্লাহ সূরা ইবরাহীমে *(১৪/২৪-২৬)* এই দু'টি গাছের কথা উল্লেখ করেছেন'।[2] ভাবুন তো! এত জ্ঞান, এত আমল, এত দাওয়াতী কার্যক্রম ও তৎপরতার পরেও কেন আমাদের হৃদয়ে এত অশান্তি? কেন এত ডিপ্রেশন, এত ভয় আর এত সংকীর্ণতা? ইবনুল ক্বাইয়িমের কথায় এর জবাব লুকিয়ে আছে। সম্ভবত আমরা আমাদের হৃদয়ের যমীনে ইখলাছের গাছের বদলে রিয়ার বিষবৃক্ষ রোপণ করে ফেলেছি। সুতরাং ইলমকে আমলে পরিণত করার জন্য এই 'রিয়া' নামক ক্যান্সার থেকে মুক্ত থাকা অপরিহার্য কর্তব্য।

রিয়া থেকে বাঁচার অন্যতম কার্যকরী অস্ত্র হ'ল গোপন ইবাদত। এমন কিছু আমল নিজের জন্য নির্দিষ্ট করুন, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ, এমনকি আপনার স্ত্রী, সন্তান বা সবচেয়ে কাছের বন্ধুও জানবে না। সেটা হ'তে পারে গভীর রাতের দু'ফোঁটা চোখের পানি, হ'তে পারে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা কোন এতিমখানায় গোপনে পাঠানো, অথবা হ'তে পারে এমন কাউকে ক্ষমা করে দেওয়া, যে আপনার ওপর চরম যুলুম করেছে ইত্যাদি। এভাবে নিজের জন্য উপযোগী গোপন আমল নিজেকে অভ্যস্ত করে ফেলুন, যা পৃথিবীকের কেউ জানবে না; জানবেন কেবল রাব্বুল আলামীন।

হজ্জ-ওমরাহ করা, কোন সেবামূলক কাজ করা, তাহাজ্জুদ পড়া প্রভৃতি কোন ভালো কাজ করার তাওফীক্ব হ'লে সাথে সাথে সোশাল মিডিয়ায় প্রচার করার মানসিকতা অবশ্যই পরিহার করা উচিত। নেক আমলের প্রতি অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য প্রচার করা হ'লে সেটা হয়ত দূষণীয় নয়। কিন্তু

**. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।*

১. ইবনুল ক্বাইয়িম জাওযিইয়াহ, আল-ফাওয়ায়েদ পৃ. ১১৯।

২. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ, পৃ. ১৬৪।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে লৌকিকতার ছোবলে আক্রান্ত হন। হয়ত প্রথম পর্যায়ে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা হয়; কিন্তু পরবর্তিতে ইখলাছের পাল্লাটা ক্রমান্বয়ে হালকা হয়ে যায়। সুতরাং আমাদে প্রতিজ্ঞা করা উচিত, যেন আমাদের অর্জিত প্রতিটি জ্ঞান, প্রতিটি নেক আমল কেবলই আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত হয়। আমাদের জ্ঞান যেন আলোহীন প্রদীপে পরিণত না হয়; বরং তা যেন হয় ইখলাছে পরিপূর্ণ এক উজ্জ্বল বাতি, যা দিয়ে আলোকিত হবে আমাদের পার্থিব জীবন, কবরের জগৎ এবং নিশ্চিত হবে পরকালীন মুক্তির ঠিকানা।

৮. ছোট-বড় সব ধরণের পাপ থেকে বেঁচে থাকা :

ইলম হ'ল নূর বা আলো, আর পাপ হ'ল অন্ধকার। আলো এবং অন্ধকার কখনো এক পাত্রে অবস্থান করতে পারে না। ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র যেমন বিশাল জাহাজকে ডুবিয়ে দিতে পারে, তেমনি একটি ছোট পাপও আমলের বিশাল সৌধকে ধসিয়ে দিতে পারে। বকর বিন আব্দুল্লাহ আল-মুযানী (মৃ. ১০৮ হি.) বলেন, رَحِمَ اللهُ عَبْدًا أُعْطِي قُوَّةً فَعَمِلَ بِهَا فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ قَصَرَ بِهِ ضَعْفٌ فَكَفَّ عَنْ مَحَارِمِ اللهِ، 'আল্লাহ সেই বান্দাকে অনুগ্রহ করুন, যাকে তিনি শক্তিমত্তা দান করেছেন। আর সে আল্লাহ্র আনুগত্যে সেই শক্তি কাজে লাগিয়েছে। অথবা দুর্বলতার কারণে আমল করতে অপারগ হ'লে আল্লাহ্র নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকেছে'।[৩] অর্থাৎ একজন মানুষ হয়ত শারীরিক ও আর্থিক শক্তিমত্তা পেয়েছে। তিনি যদি এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে রাতে তাহাজ্জুদ পড়েন এবং আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করেন, তবে তিনি যেমন আল্লাহ্র ইবাদত করলেন। ঠিক তেমনি আরেকজন ব্যক্তি অসুস্থতা বা শারীরিক দুর্বলতার কারণে হয়তো রাতে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারেন না, কিন্তু তিনি এই দুর্বলতার অজুহাতে মোবাইল বা টেলিভিশনে হারাম কনটেন্ট, গান-বাজনা, নাটক-সিনেমা দেখা থেকে বিরত থাকেন, তবে তিনিও আল্লাহ্র ইবাদত করলেন। কেননা নেক আমল করা যেমন ইবাদত, তেমনি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পাপ থেকে বিরত থাকাও ইবাদত। এভাবে শক্তিতে নেক আমল করা অথবা দুর্বলতায় পাপ বর্জন করা–দুটোই আল্লাহ্র কাছে প্রিয়। এই দুই প্রকার ইবাদতই আল্লাহ্র কাছে প্রিয়তর। ধরুন! আপনি একজন চাকুরীজীবি। আপনার অফিসে সবাই ঘুষ খায়, কিন্তু আপনি সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খান না। অথবা আপনি ব্যবসায়ী। বাজারের সবাই খাদ্যে ভেজাল দেয়, কিন্তু আপনি দেননা, গ্রাহককে ঠকান না; তখন এই 'পাপ থেকে বিরত থাকার আমল' নফল ছালাতের চেয়েও আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় হ'তে পারে।

ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু'আয আর-রাযী (মৃ. ২৫৮ হি.) বলেন, لست آمركم بترك الدنيا، آمركم بترك الذنوب، ترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة، وأنتم إلى إقامة الفريضة أحوج منكم إلى الحسنات والفضائل، 'আমি তোমাদের দুনিয়া পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিচ্ছি না। বরং তোমাদেরকে পাপ পরিত্যাগের নির্দেশ দিচ্ছি। কেননা দুনিয়াকে উপেক্ষা করা অতিরিক্ত মর্যাদাপ্রাপ্তির বিষয়। কিন্তু পাপ পরিহার করা ফরয। সৎ আমল ও ফযীলতপূর্ণ কাজসমূহের চেয়ে তোমাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হ'ল ফরযকে প্রতিষ্ঠা করা'।[৪]

অনেক সময় আমার হৃদয়ের মনিকোঠায় নেক আমলের স্বপ্ন জাগে। রাত জেগে আল্লাহ্র ভয়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে, তাহাজ্জুদ পড়তে মন চায়। কিন্তু যখনই হাতের মোবাইল ফোনে কোন হারাম কনটেন্ট আসে, তখন মুহূর্তেই সেই অনুভূতিগুলো হারিয়ে যায়। যদি একজন বান্দা আল্লাহ্র ভালোবাসার খাতিরে সেই মুহূর্তে মোবাইলটা দূরে সরিয়ে দিতে পারে, তবে সেই 'গুনাহ বর্জন করার আমল' হয়তো রাতের দীর্ঘ তাহাজ্জুদের চেয়েও আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয় হ'তে পারে। কারণ, এই পাপ বর্জনের মাধ্যমেই তিনি প্রমাণ করেন যে, তার হৃদয়ে আল্লাহ্র নির্দেশই সর্বোচ্চ স্থান দখল করে আছে। তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী (৪০-১০৮হি.) বলেন, مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ تَرْكِ الْمَعَاصِي 'গুনাহ বর্জন করার চেয়ে আল্লাহ্র নিকট অধিক পসন্দনীয় কোন ইবাদত করা হয় না'।[৫]

ইমাম শাফে'ঈ (রহঃ) বলেন, اجتِنَابُ المَعَاصِي، وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِيكَ يُنَوِّرُ القَلْبَ 'গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং অনর্থক বিষয় পরিত্যাগ করা অন্তরে নূর পয়াদা করে'।[৬] হাসান আল-মুযাইয়িন (রহঃ) বলেন, الذَّنْبُ بَعْدَ الذَّنْبِ عُقُوبَةُ الذَّنْبِ وَالْحَسَنَةُ بَعْدَ الْحَسَنَةِ ثَوَابُ الْحَسَنَةِ 'গুনাহের পরে গুনাহ করা আগের গুনাহের শাস্তি। আর নেক আমলের পরে নেক আমল করতে পারা আগের নেক আমলের প্রতিদান'।[৭] যেমন, আপনি হয়তো সকালে আলসেমি করে ফজরের ছালাত জামা'আতে পড়তে পারলেন না, এটি একটি পাপ। এই পাপের শাস্তি স্বরূপ দেখবেন, যোহরের সময় আপনার মন আরও আলসে হয়ে গেছে বা আপনি দিনের বেলায় কোন হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে গেছেন। অথবা আপনি যদি একটি মিথ্যা কথা বলেন, দেখবেন সেই মিথ্যাকে ঢাকার জন্য আরো কয়েকটি মিথ্যা কথা আপনাকে বলতে হবে। এটিই হ'ল পাপের পর পাপের চক্র। অপরদিকে আপনি যদি একটি ছোট নেক কাজ করেন- যেমন, ঘর থেকে বের হওয়ার সুন্নাতী দু'আটি মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। দেখবেন, এই ছোট

---

৩. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ২/২২৯।

৪. ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া ২/২৯৭।

৫. ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের, ১/২০।

৬. যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৯৮।

৭. ইবনুল জাওযী, যাম্মুল হওয়া, পৃ. ১৮৫।

আমলের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ আপনাকে পথ চলতে আরেকজনকে হাসিমুখে সালাম দেওয়ার বা কোন বিপদে পড়া ব্যক্তিকে সাহায্য করার সুযোগ করে দিয়েছেন। ছোট-বড় যে কোন ধরণের পাপ থেকে বাঁচার মাধ্যমে এই নেক আমলের প্রতিদানের চক্রকে আমাদের জীবনে পরম যত্নে আগলে রাখা উচিত।

৯. নেক আমলের সুযোগ লাভের সাথে সাথে দ্রুত সম্পাদন করা :

আমল করার সুযোগ আমাদের জীবনে বসন্তের ক্ষণস্থায়ী মেঘের মতোই আসে এক পলকে আসে, আবার দেখতে না দেখতেই দ্রুত মিলিয়ে যায়। ইসলাম আমাদের শেখায় যে, যখনই নেক আমল করার সুযোগ আসবে, সাথে সাথে সেটা সম্পাদন করতে হবে। কারণ ইলম অনুযায়ী আমল করতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল 'পরে করব' বা 'আগামীকাল করব' নামক অলসতার ফাঁদ। আমলের ক্ষেত্রে দ্রুততা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ 'আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য' *(আলে ইমরান ৩/১৩৩)*। এখানে দ্রুত ধাবিত হওয়ার অর্থ হ'ল- سارعوا إلى ما يوجب المغفرة من الطاعات 'সেই সব আনুগত্যমূলক কাজের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যা ক্ষমাকে অনিবার্য করে তোলে'।[৮] আর 'তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে' দ্রুত ধাবিত হওয়ার অর্থ হ'ল– 'আল্লাহ্র সেই ব্যাপক রহমতের দিকে ছুটে যাওয়া, যা আমাদের পাপসমূহকে তাঁর দয়ার চাদরে ঢেকে দিয়ে গোপন করে রাখে এবং যার ফলে তিনি আমাদের গুনাহের কারণে প্রাপ্য শাস্তি থেকে পূর্ণ মুক্তি দান করেন'।[৯] মূলত আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে নেক আমলের সুযোগ আসার সাথে সাথে তা দ্রুত সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ সুযোগ চলে গেলে আমলও হাতছাড়া হয়ে যায়।

সুফইয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.) বলেন, إِذَا هَمَمْتَ بِصَدَقَةٍ أَوْ بِرٍّ أَوْ بِعَمَلٍ صَالِحٍ فَعَجِّلْ مُضِيَّهُ مِنْ سَاعَتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الشَّيْطَانُ 'যখন তুমি কোন ছাদাক্বা, সৎকাজ অথবা কোন নেক আমল করার মনস্থ করবে, তখন তোমার ও তোমার সেই আমলের মাঝে শয়তান কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার আগেই খুব দ্রুত সেটা সম্পাদন করে ফেল'।[১০] ধরুন! হঠাৎ আপনার মনে হ'ল যে, পাশের বস্তির গরিব লোকটি খুব কষ্টে আছে, তাকে এখনই এক হাযার টাকা দিয়ে সাহায্য করা উচিত। আপনার ইলম আপনাকে ছাদাক্বাহ্ করার ফযীলত সম্পর্কে বলেছে এবং আপনার মন সায় দিয়েছে। কিন্তু আপনি ভাবলেন, 'আচ্ছা, এখন তো ক্যাশ নেই, কাল অফিস থেকে ফেরার পথে দেব'। শয়তান ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে তখনই আপনার মনে কুমন্ত্রণা দেবে– 'তোমার তো আরও কিছু বিল বাকি আছে, এক হাযার টাকা বেশী হয়ে যায়, কাল বরং পাঁচশো দিও'। ফলস্বরূপ, আপনি কাল পাঁচ শত টাকা দান করলেন, অথবা দেখা যাবে ছাদাক্বাহ্ করলেনই না। আপনার ইলম অনুযায়ী আমলের সুযোগটি চিরতরে হাতছাড়া হয়ে গেল। তাই যখনই মনের মধ্যে নেক কাজের ইচ্ছা জন্মায়, তখনই সামান্য বিলম্ব না করে তা দ্রুত সম্পাদন করে ফেলুন।

আমল করার সুযোগকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয়, তার শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ হ'লেন আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)। তিনি ইলমের আলোকে আমলের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ ছিয়াম রেখেছ? আবুবকর (রাঃ) উত্তর দিলেন, আমি। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বললেন, কে আজ জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করেছ? আবুবকর বললেন, আমি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ মিসকীনকে খাদ্য দান করেছ? আবুবকর বললেন, আমি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আজ পীড়িতকে দেখতে গিয়েছ? আবুবকর বললেন, আমি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ '(জেনে রেখ!) যে ব্যক্তির মধ্যে এই গুণাবলীর একত্রে সমাবেশ ঘটবে, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[১১] অর্থাৎ আবুবকর (রাঃ) সময়কে এত সুন্দরভাবে কাজে লাগাতেন যে, নেক আমলের কোন সুযোগকে তিনি হাত ছাড়া করতেন না। যখনই কোন সৎকাজের সুযোগ পেয়েছেন, তখনই সেটা করার চেষ্টা করেছেন।

লক্ষ্য করুন! আবুবকর (রাঃ) কেবল ইলম অর্জন করেননি; তিনি সেই ইলমের প্রতিটি ক্ষেত্রকে কাজে লাগানোর জন্য সারাদিন সচেষ্ট থাকতেন। তিনি সকালে ছিয়ামের নিয়ত করেছেন, জানাযায় শরীক হয়েছেন, রুগী দেখতে গিয়েছেন এবং ছাদাক্বাহ করেছেন। সবই এক দিনে। আজকের যুগে আমরা যারা চাকরি করি বা ব্যবসা করি, তারাও যদি ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য দিনের শুরুতে একটি 'নেক কাজের রুটিন' তৈরি করতে পারি, তবে আমরাও এভাবে একাধিক আমলের সুযোগ কাজে লাগাতে পারব। যেমন: অফিসে যাওয়ার পথে কোন গরীব ব্যক্তিকে দু'টাকা ছাদাক্বাহ করা, মসজিদে কৌটাতে কিছু টাকা দান করা, কাজের ফাঁকে অসুস্থ সহকর্মীর খোঁজ নেওয়া, বৃহস্পতি ও সোমবার ছিয়াম রাখা, সফরে গাড়িতে বসে থাকার সময়কে কাজে লাগিয়ে যিকর করা বা কুরআন তেলাওয়াত করা, ব্যাংকে লাইনে দাড়িয়ে-ড্রাইভিংয়ে-সাংসারিক কাজের সময় যিকির করা,

---

৮. তাফসীরে কুরতুবী, ৪/২০৩; ফাৎহুল কাদীর ১/৪৩৬।
৯. তাফসীরে তাবারী (জামে'উল বায়ান), ৭/২০৭।
১০. আবূ নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৭/৬১।
১১. মুসলিম হা/১০২৮; মিশকাত হা/১৮৯১।

ইত্যাদি। এটাই হ'ল সেই দ্রুততা, যা একজন মুমিনকে জান্নাতের হক্বদার করে তোলে।

তবে নেক আমলের দ্রুততা মানে এই নয় যে, আপনি সব আমল একাই করবেন; বরং আপনি সেই আমলের সুযোগটিতে মনোযোগী হবেন, যা আল্লাহ আপনার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ قَسَمَ الْأَعْمَالَ كَمَا قَسَمَ الْأَرْزَاقَ، فَرُبَّ رَجُلٍ فُتِحَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ فِي الصَّوْمِ، وَآخَرَ فُتِحَ لَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَلَمْ يُفْتَحْ لَهُ فِي الصَّوْمِ، وَآخَرَ فُتِحَ لَهُ فِي الْجِهَادِ. فَنَشْرُ الْعِلْمِ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ، وَقَدْ رَضِيْتُ بِمَا فُتِحَ لِي فِيْهِ 'আল্লাহ রিযিক্ব বণ্টনের মতো আমলও বণ্টন করে দিয়েছেন। কতক ব্যক্তির জন্য ছালাত সহজ করা হয়েছে, কিন্তু ছিয়াম সহজ করা হয়নি। আবার আরেক জনের জন্য দান-ছাদক্বাহর সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তাকে ছিয়ামের জন্য সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি। আবার কাউকে জিহাদ করার তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে। তবে নেক আমলসমূহের মধ্যে ইলমের প্রচার-প্রসারই সর্বোত্তম। আর আল্লাহ আমার জন্য যে ইবাদত সহজ করে দিয়েছেন, আমি তাতেই সন্তুষ্ট'।[১২] এটা বাস্তব যে, সবার ইবাদতের ধারা এক নয়। করো জন্য হয়ত আল্লাহ ছিয়াম রাখা সহজ করেছেন, আবার আরেকজন হয়ত শারীরিকভাবে দুর্বল, তাই ছিয়ামের চেয়ে তাহাজ্জুদ তার কাছে সহজ করে দেওয়া হয়েছে। কারো জন্য অফলাইনে দাওয়াতী কাজকে সহজ করেছেন, কাউকে হয়ত অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সঠিক ইলম প্রচার করা সহজ করেছেন। ইলম অনুযায়ী আমল করার ক্ষেত্রে আমাদের সেই আমলের সুযোগটি দ্রুত লুফে নেওয়া উচিত, যা আল্লাহ আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন এবং যাতে আমরা মন থেকে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করব। কেননা কালক্ষেপণ না করে নিজের সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী দ্রুত নেক কাজ করে ফেলা প্রকৃত মুমিন ও জান্নাতী মানুষের বৈশিষ্ট্য।

১০. সুন্নাত মোতাবেক নেক আমল করা :

কোন আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। একটি হ'ল ইখলাছ, অপরটি হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইত্তেবা। এই দু'টি শর্তের কোন একটি অনুপস্থিত থাকলে আমাদের সকল আমল ও ইবাদত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সেজন্য ইলমকে আমলে রূপদানের করতে হ'লে সেই আমল আবশ্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, إِنَّ الْعَمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يُقْبَلْ، حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا صَوَابًا فَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ، وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السُّنَّةِ 'আমল একনিষ্ঠ হ'লেও যদি তা সঠিক না হয়, তাহ'লে সেই আমল কবুল হবে না। আবার যদি সঠিকভাবে আমল সম্পাদন করা হয়, কিন্তু সেটা যদি একনিষ্ঠভাবে করা না হয়, সেই ক্ষেত্রেও আমল কবুল হবে না। যতক্ষণ সেই আমল একইসাথে খালেছ ও সঠিক না হবে। আমল খালেছ হওয়ার অর্থ হ'ল তা কেবল আল্লাহ্র জন্যই সম্পাদিত হওয়া। আর সঠিক হওয়ার অর্থ হ'ল সেই আমল রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত মোতাবেক হওয়া।[১৩]

ধরুন! আপনি একজন ব্যক্তিকে দান করছেন। যদি আপনি কেবল মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য দান করেন, তবে সেই দান সুন্নাত অনুযায়ী হলেও ইখলাছ না থাকার কারণে কবুল হবে না। আবার আপনি হয়তো সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে খুশী করার জন্য একটি নতুন পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করলেন, যা নবী করীম (ছাঃ) কখনো করেননি, তবে সেই আমলও কবুল হবে না। কেননা এই আমল ইখলাছের সাথে সম্পাদিত হ'লেও রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী হয়নি। যে কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে এই ইলমটুকু যদি আমাদের আত্মস্থ না হয়, তবে আমাদের সকল শ্রম পশুশ্রমে পর্যবসিত হ'তে পারে। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, الْعَمَلُ بِغَيْرِ إِخْلَاصٍ وَلَا اقْتِدَاءٍ كَالْمُسَافِرِ يَمْلَأُ جِرَابَهُ رَمْلًا يُثْقِلُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ 'ইখলাছ ও নবীর আনুগত্য বিহীন আমল হচ্ছে সেই মুসাফিরের মতো যে তার পকেট বালু দিয়ে ভর্তি করে। সেই বালু তার পকেট ভারী করলেও তার কোন উপকার করতে পারে না'।[১৪]

সুফিয়ান ছাওরী (রাঃ) বলেন- لَا يُقْبَلُ قَوْلٌ إِلَّا بِعَمَلٍ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَّةٌ إِلَّا بِمُوَافَقَةِ السُّنَّةِ 'কোন কথা গ্রহণযোগ্য হয় না, যতক্ষণ না সেই কথার উপর আমল করা হয়। কোন কথা ও আমল সঠিক হয় না, যতক্ষণ না তার নিয়ত বিশুদ্ধ করা হয়। আর কোন কথা, আমল ও নিয়ত বিশুদ্ধ হয় না, যতক্ষণ না তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী হয়'।[১৫] আমরা অনেক সময় সুন্নাতকে অবহেলা করি। যা আমাদের আমলী যিন্দেগীর উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ ব্যাপারে সতর্ক করে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, مَنْ تَهَاوَنَ بِالْأَدَبِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ السُّنَنِ، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالسُّنَنِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْفَرَائِضِ، وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْفَرَائِضِ عُوقِبَ بِحِرْمَانِ الْمَعْرِفَةِ، 'যে ব্যক্তি নীতি-নৈতিকতাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তাকে সুন্নাত (আমল সম্পাদনের সুযোগ) থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি সুন্নাত আমল উপেক্ষা করে চলে, তাকে ফরয ইবাদত থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি ফরয আমল সম্পাদনে অবহেলা করে, তাকে আল্লাহ্র পরিচয় লাভের

১২. *যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১৮৮।*

১৩. *ইবনু তাইমিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম, ২/৩৭৩।*
১৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ফাওয়ায়েদ ১/৬৬।*
১৫. *ইবনুল জাওযী, তালবীসে ইবলীস, পৃঃ ১১।*

তাওফীক্ব থেকে বঞ্চিত করে শাস্তি দেওয়া হয়'।[১৬] আমরা কি কখনো ভেবেছি যে, সুন্নাতী পদ্ধতিতে খাওয়া বা ঘুমানোর মতো ছোট ছোট আদব উপেক্ষা করার কারণেই হয়তো আমরা ফজরের ছালাতের জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার মতো ফরয আমল থেকে বঞ্চিত হচ্ছি? এটি ইলমের এক গভীর উপলব্ধি। সুন্নাত আমল হ'ল ফরয ইবাদতের রক্ষাকবচ। সুন্নাতের প্রতি যত্নশীল হ'লে আল্লাহ ফরযকে রক্ষা করার তাওফীক্ব দেন। পক্ষান্তরে সুন্নাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে এক সময় ফরযও হাতছাড়া হয়ে যায়। ফলে বান্দা আল্লাহ্র শাস্তির হকদার হয়ে যায়। সুতরাং একজন সফল মুমিনের অপরিহার্য কর্তব্য হ'ল ইলমকে সুন্নাহ্র রঙে রাঙিয়ে তোলা এবং আক্বীদা-আমলকে বিদ'আত মুক্ত করা।

১১. আত্মমুগ্ধতা ও নেক আমলের ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকা :

আমল সম্পাদন করা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ সফলতা। কিন্তু আমলের পরে যে বিপদটি ওঁৎ পেতে থাকে, তা হ'ল 'উজব' বা আত্মমুগ্ধতার ধোঁকা। এটি এমন এক গোপন শত্রু, যা আমলকে তার রবের দরবারে পৌঁছানোর আগেই ভেতরে ভেতরে ধ্বংস করে দেয়। একটি ইবাদতের পর যখন আমাদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে, 'আমি কত বড় ইবাদতকারী'! বা 'আমার মতো নেক কাজ ক'জন করে?', তখনই সেই উজব আমাদের আমলকে বাতিল করে দেওয়ার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসে।

ইলম আমাদের শেখায় যে, আমরা যখন যত্নশীলতার সাথে ফরয ইবাদত করি, দ্বীনের খেদমত করি বা অন্যকে সাহায্য করতে পারি, তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এই আমল সমূহের কোন কৃতিত্ব আমাদের নয়; বরং এটা মহান আল্লাহ্র এক বিশাল তাওফীক্ব ও অনুগ্রহ। আমরা যখন এই অনুগ্রহের অনুভূতি ভুলে যাই, ঠিক তখনই আমাদের হৃদয়ে অহংকার ও আত্মমুগ্ধতা জন্ম নেয়।

আমাদের পূর্ববর্তী নেককার বান্দারা এই উজব থেকে কতটা সতর্ক থাকতেন, তা জানলে আমরা আজকের যুগে নিজেদের আমল নিয়ে কী পরিমাণ ধোঁকায় আছি, তা বুঝতে পারবো। বিশর আল-হাফী (রহঃ) বলেন, لَقَدْ أَدْرَكْنَا النَّاسَ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ صَالِحَةٌ كَالْجِبَالِ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانُوا لَا يَغْتَرُّونَ، وَأَنْتُمْ لَا أَعْمَالٌ لَكُمْ وَمَعَ ذَلِكَ تَغْتَرُّونَ، وَاللهِ إِنَّ أَقْوَالَنَا أَقْوَالُ الزَّاهِدِينَ، وَأَعْمَالُنَا أَعْمَالُ الْجَبَابِرَةِ وَالْمُنَافِقِينَ 'আমরা এমন মানুষের সাক্ষাত পেয়েছি, যাদের পাহাড় সমপরিমান নেক আমল থাকা সত্ত্বেও তারা আমলের ধোঁকায় পড়তেন না। অথচ তোমাদের উল্লেখ্যযোগ্য আমলই নেই, তথাপি তোমরা ধোঁকায় পড়ে আছ। আল্লাহ্র কসম! আমরা দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তিদের মত কথা বলি, কিন্তু আমাদের কর্মকান্ড অহংকারী ও মুনাফিকদের মত'।[১৭]

এই কথাগুলো যেন আমাদের যুগের মুসলিমদের জন্য আয়নার মতো। আমরা হয়তো দু'চারটে নফল ছালাত আদায় করেই নিজেকে আল্লাহ্র অলী মনে করতে শুরু করি। কোন বান্দা হয়তো প্রতি রাতেই তাহাজ্জুদ পড়েন। এই ইলম তার আছে যে, এটি বিরাট ফযীলতের কাজ। কিন্তু যখন তার পরিবারের অন্য কেউ অলসতা করে ফযরের জন্য উঠতে পারে না, আর তখন তার মনে যদি গোপন অহংকার জন্ম নেয় যে, 'আমিই কেবল ইবাদতকারী, বাকিরা সব অলস', তখন তার এই আত্মমুগ্ধতা তার সেই তাহাজ্জুদের পাহাড়সম ছওয়াবকে ধ্বংস করে দিতে পারে। অথচ সালাফে ছালেহীনদের আমল পাহাড়সম ছিল, কিন্তু তাদের হৃদয় ছিল ধূলিকণার মত বিনয়ী।

আমলের পর আত্মমুগ্ধতা আসার মূল কারণ হ'ল, আমরা আমলকে নিজের অর্জন মনে করি এবং এর কবুলিয়াতের ব্যাপারে নিশ্চিত হ'তে চাই। অথচ আমল কবুল হ'ল কিনা, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আওন (রহঃ) বলেন, لَا تَثِقْ بِكَثْرَةِ الْعَمَلِ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُقْبَلُ مِنْكَ أَمْ لَا، وَلَا تَأْمَنْ ذُنُوبَكَ، فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي كُفِّرَتْ عَنْكَ أَمْ لَا، إِنَّ عَمَلَكَ مَغِيبٌ عَنْكَ كُلُّهُ– 'তুমি তোমার আমলের আধিক্য দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থেকো না। কেননা তুমি তো জাননা যে, তোমার সেই আমলগুলো কবুল করা হয়েছে কিনা। আর তোমার গুনাহ থেকেও নিজেকে নিরাপদ মনে করো না। কেননা তুমি তো জাননা যে, সেগুলি মাফ করা হয়েছে কিনা। (সুতরাং, তুমি জেনে রাখ!) তোমার আমলের নেকী তোমার নিকট থেকে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য রয়েছে'।[১৮] ইবরাহীম ইবনে আশ'আছ (রহঃ) বলেন, أَكْذَبُ النَّاسِ الْعَائِدُ فِي ذَنْبِهِ، وَأَجْهَلُ النَّاسِ الْمُدِلُّ بِحَسَنَاتِهِ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ أَخْوَفُهُمْ مِنَ اللَّهِ 'সবচেয়ে মিথ্যুক মানুষ সেই ব্যক্তি, যে (তওবা করেও) বারবার পাপাচারে ফিরে আসে। নিরেট মূর্খ সেই ব্যক্তি, যে নেক আমল নিয়ে আহংকার করে। আর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি সেই, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে'।[১৯] মাসরূক্ব (মৃ.৬২হি.) বলেন, كَفَى بِالْمَرْءِ عِلْمًا أَنْ يَخْشَى اللَّهَ. وَكَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ يُعْجَبَ بِعَمَلِهِ 'মানুষের জ্ঞানী হওয়ার জন্য একটুকুই যথেষ্ট যে, সে আল্লাহকে ভয় করবে। আর মানুষের মূর্খ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের আমল নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগবে'।[২০]

প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবন জুবায়ের (৪৪-৯৫হি.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, مَنْ أَعْبَدُ النَّاسِ؟ 'কে সবচেয়ে বড় ইবাদতগুজার ব্যক্তি?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, رَجُلٌ اجْتَرَحَ مِنَ الذُّنُوبِ فَكُلَّمَا ذَكَرَ ذَنْبَهُ احْتَقَرَ عَمَلَهُ 'ঐ ব্যক্তি, যে

১৬. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান ৪/৫৫৯।
১৭. আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, তাম্বীহুল মুগতার্রীন, পৃ. ৫৫।
১৮. ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম ২/৫২২।
১৯. শামসুদ্দীন যাহাবী, তারীখুল ইসলাম ১২/৩৪৩।
২০. ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা ৬/১৪২।

(অতীতে) কোন একটা পাপ কাজ করেছিল, তারপর যতবার ঐ পাপের কথা তার মনে আসে, ততবার নিজের আমল তুচ্ছ মনে করে'।[২১]

এক্ষণে হৃদয়যমীন থেকে আত্মমুগ্ধতার আগাছা পরিস্কার করার উপায় কি? এ ব্যাপারে শাক্বীফ ইবনে ইবরাহীম বলখী (রহঃ) বলেন, حُسْنُ الْعَمَلِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ: أَوَّلُهَا أَنْ يَرَى أَنَّ الْعَمَلَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِيَكْسِرَ بِهِ الْعُجْبَ، وَالثَّانِي أَنْ يُرِيدَ بِهِ رِضَا اللَّهِ لِيَكْسِرَ بِهِ الْهَوَى، وَالثَّالِثُ أَنْ يَبْتَغِيَ ثَوَابَ الْعَمَلِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لِيَكْسِرَ بِهِ الطَّمَعَ وَالرِّيَاءَ، وَبِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ تَخْلُصُ الْأَعْمَالُ 'তিনটি বিষয় আমলকে পরিশুদ্ধ বা রিয়ামুক্ত রাখে : (১) এই মর্মে বিশ্বাস রাখা যে, নেক আমলের তাওফীক্ব আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয়, তাহ'লে আত্মমুগ্ধতা দূর হয়ে যাবে। (২) আমলের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি তালাশ করা, তাহ'লে প্রবৃত্তির চাহিদা দমিত হবে। (৩) নেক আমলের নেকী একমাত্র আল্লাহ্র নিকটেই কামনা করা, তাহ'লে রিয়া ও লোভ দমে যাবে। এই তিনটি বিষয়ের মাধ্যমে আমল পরিশুদ্ধ বা রিয়ামুক্ত হয়'।[২২]

১২. ইলমের যাকাত দেওয়া :

ইসলামে সম্পদের যাকাত যেমন সম্পদকে পবিত্র করে এবং তাতে বরকত নিয়ে আসে, ঠিক তেমনি আমাদের অর্জিত ইলমের যাকাতও আত্মাকে পবিত্র করে এবং জ্ঞানকে আরও বৃদ্ধি করে স্থায়িত্ব দান করে। যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করে তাকে সিন্দুকের মধ্যে ভরে রাখে, সে কৃপণের মত। আর অর্জিত ইলমের যাকাত হ'ল অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী নিজে আমল করা, অজ্ঞকে শেখানো এবং বিভ্রান্তকে পথ দেখানো। ইলমের যাকাত আদায় না করলে সেই জ্ঞান ক্বিয়ামতের দিন আমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ইলম অনুযায়ী আমল করার একটি অপরিহার্য ধাপ হ'ল এই যাকাত আদায় করা। আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর বলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-কে এক লোকের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'ল- যে প্রচুর হাদীছ লিখে এবং প্রচুর পরিমাণে জ্ঞান আহরণ করে। তবে এই লোকের কী করা উচিত। তখন তিনি বললেন, 'তার উচিত যতটা সে জ্ঞান বাড়ায়, ততটাই যেন সে তার ওপর আমলও বাড়ায়। কেননা, سَبِيْلُ الْعِلْمِ مِثْلُ سَبِيْلِ الْمَالِ، إِنَّ الْمَالَ إِذَا زَادَ: زَادَتْ زَكَاتُهُ 'ইলমের উদাহরণ সম্পদের মতো। সম্পদ যখন বেড়ে যায়, তখন তার যাকাতও বৃদ্ধি পায়'।[২৩]

ভাবুন তো! আমাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যখন সম্পদ বাড়ে, তখন কি আমরা যাকাত দেওয়া বন্ধ করে দেই? না; বরং সম্পদের পরিমাণ বাড়ার সাথে সাথে যাকাতের পরিমানও বাড়ে। ঠিক তেমনি, আমরা যখন একটি নতুন মাসআলা বা একটি নতুন হাদীছ শিখি, তখন আমাদের ইলমের সম্পদ বাড়ে। এই অতিরিক্ত ইলমের যাকাত হ'ল সেই নতুন জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। এখন আপনি যদি জানেন যে, রাতে ঘুমানোর আগে অমুক দো'আটি পড়া সুন্নাত; কিন্তু আপনি তা আমল করছেন না, তবে আপনি আপনার ইলমের যাকাত আদায় করছেন না বলেই গণ্য হবে।

সালাফে ছালেহীন মনে করতেন, কোন হাদীছ বা ইলম শোনার সাথে সাথেই তা আমল করাই হ'ল সেই জ্ঞানের যাকাত। কাসেম ইবনে ইসমাঈল বলেন, আমরা বিশর ইবনে হারেছ আল-হাফী (রহঃ)-এর দরজায় ছিলাম। তিনি বেরিয়ে আসলে আমরা বললাম, হে আবূ নাছর! আমাদের হাদীছ কোন ন। তিনি বললেন, তোমরা কি হাদীছের যাকাত আদায় কর? তখন আমি বললাম, يَا أَبَا نَصْرٍ، وَلِلْحَدِيثِ زَكَاةٌ؟ 'হে আবূ নাছর! হাদীছেরও কি যাকাত আছে? তিনি বললেন, نَعَمْ، إِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ فَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ مِنْ عَمَلٍ أَوْ صَلَاةٍ أَوْ تَسْبِيحٍ اسْتَعْمَلْتُمُوهُ 'হ্যাঁ, যখন তোমরা হাদীছ শুনবে, আর তাতে যে আমল, ছালাত বা তাসবীহের কথা থাকবে, তা তোমরা আমল করবে (এটাই হ'ল হাদীছের যাকাত)'।[২৪]

ইলমের যাকাত শুধু ব্যক্তিগত আমলেই সীমাবদ্ধ নয়; এর একটি বৃহৎ অংশ হ'ল উম্মাহর প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন। আল্লামা বকর বিন আব্দুল্লাহ আবু যায়েদ (রহঃ) বলেন, أَدِّ زكاة العلم صادعًا بالحق، أمّارًا بالمعروف، ونهّاءً عن المنكر، موازنًا بين المصالح والمضارّ، ناشرًا للعلم، وحبّ النفع 'তুমি ইলমের যাকাত আদায় করো, সত্যকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে, সৎকাজের আদেশ দিয়ে, অসৎ কাজে নিষেধ করে, কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে ভারসাম্য রেখে, ইলম প্রচার করে এবং (মানুষের) উপকার করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে'।[২৫]

সম্মানিত পাঠক! বর্তমান মুসলিম সমাজ যখন শিরক-বিদ'আত, অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাচ্ছে, ইহুদী-নাছারাদের বস্তাপঁচা মতবাদ আমদানী করে মুসলিম সমাজের ঈমানী পরিবেশকে দূষিত করে ফেলছে, তখন আপনার ইলম আপনাকে চিৎকার করে বলছে- অভ্রান্ত সত্যের চিরন্তন উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাণী সাহসের সাথে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করুন, নববী আদর্শে সমাজকে ঢেলে সাজানোর শপথ নিন, তাওহীদের ঝান্ডাকে আপোষহীনভাবে উড্ডীন রাখুন, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধের ব্যাপারে সর্বদা সোচ্চার থাকুন। যখন আপনি এটা করতে পারবেন, তখন যেন আপনি আপনার

২১. *হাফেয ইবনে কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৯/১১৯; আহমাদ ইবনে হাম্বাল, কিতাবুয যুহদ, পৃ. ৩১৪।*
২২. *সামারকান্দি, তাম্বীহুল গাফেলীন, পৃ: ৩০।*
২৩. *ইবনু আবী ইয়া'লা, তাবাক্বাতুল হানাবিলা, ২/২৩; ইবনু মুফলিহ, আল-আদাবুশ শারঈয়্যাহ ২/১৭৫।*
২৪. *খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে' লি আখলাক্বির রাবী, ১/১৪৩।*
২৫. *বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবূ যায়েদ, হিলয়াতু ত্বালিবুল ইলম (রিয়াদ : দারুল আছিমাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৬হি.), পৃ. ১৯১।*

অর্জিত ইলমের যাকাত আদায় করলেন। এই ইলমের যাকাত আদায়ের মাধ্যমেই আপনার জ্ঞান শুদ্ধ হবে, বৃদ্ধি পাবে এবং ক্বিয়ামতের দিনে তা আপনার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আর এভাবে অর্জিত ইলম সার্বিক জীবনে বাস্তবায়িত হবে।

১৩. আল্লাহ্র কাছে তাওফীক্ব কামনা করা :

ইলম অনুযায়ী আমল করার এই দীর্ঘ, বন্ধুর ও পবিত্রতম সফরের চূড়ান্ত চালিকাশক্তি হ'ল আল্লাহ্র তাওফীক্ব বা একচ্ছত্র সাহায্য। আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, আল্লাহ্র তাওফীক্ব ছাড়া কোন নেক কাজ করা সম্ভব নয়। ইলম অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব আল্লাহ্রই হাতে। তাই একজন মুমিন জ্ঞান অর্জনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র কাছে দো'আ করে যে, তিনি যেন তাকে আমল করার সামর্থ্য দেন এবং কবুল করেন। এই দো'আ হ'ল আমাদের দীনতা ও রবের প্রতি মুখাপেক্ষিতার বহিঃপ্রকাশ এবং আমলের পথে অবিচল থাকার প্রধান উপায়। যখন শু'আইব (আঃ)-এর কওম তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، 'আর আমার কোনই ক্ষমতা নেই আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত। আমি তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে যাই' *(হূদ ১১/৮৮)*।

প্রত্যেক নবী আমলের তাওফীক্ব কামনা করে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করতেন। যেমন সুলাইমান (আঃ) প্রার্থনা করতেন এভাবে, رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর যাতে আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নামল ২৭/১৯)*।

আল্লাহ্র কাছে তাওফীক্ব চাওয়ার এবং আমলের পথে স্থির থাকার সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি হ'ল নবী করীম (ছাঃ)-এর শেখানো দো'আগুলি পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায়শই দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا 'হে আল্লাহ ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই এমন ইলম থেকে, যা কোন উপকারে আসে না। এমন হৃদয় থেকে যা (আপনাকে) ভয় করে না। এমন নফস থেকে যা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দো'আ থেকে যা কবুল হয় না'।[২৬]

আমাদের দুর্বলতা ও আলস্য যেন ক্বিয়ামতের দিন আমাদের ক্ষতির কারণ না হয়, সেজন্য নবী করীম (ছাঃ) আমাদের আরেকটি দো'আ শিখিয়েছেন, اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ، وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ 'হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যা আমল করেছি তার অনিষ্ট থেকে এবং যে আমল করিনি তার অনিষ্ট থেকে'।[২৭] তিনি বলতেন, يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ 'হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখুন'।[২৮] তিনি আরো বলতেন, اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ 'হে হৃদয়ের পরিবর্তনকারী! আমার হৃদয়কে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে রাখুন'।[২৯]

যদি আল্লাহ্র তাওফীক্ব না থাকে, তবে আমাদের জ্ঞান কেবল মুখে উচ্চারিত হবে, আর আমলের ক্ষেত্রে তা ভুলে ভরা থাকবে। এটি ইলম অনুযায়ী আমল না করার এক করুণ পরিণতি। মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন, تَلْقَى الرَّجُلَ وَمَا يَلْحَنُ حَرْفًا وَعَمَلُهُ لَحْنٌ كُلُّهُ 'তুমি এমন ব্যক্তির সাক্ষাত পাবে, যে একটি বর্ণও ভুল উচ্চারণ করবে না। কিন্তু তার আমলের সবটাই হল ভুল'।[৩০]

আজকের যুগে এমন আলেমের অভাব নেই, যারা বিশুদ্ধ আরবী উচ্চারণে কুরআন ও হাদীছের ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত জীবন সুদের লেনদেন, মিথ্যা, গীবত বা অন্য পাপাচারে ভরা। তাদের কথা নিখুঁত, কিন্তু আমল ভুলে ভরা। এটাই সেই করুণ দৃশ্য, যখন বান্দা নিজের জ্ঞানের উপর ভরসা করে আল্লাহ্র তাওফীক্ব চাইতে ভুলে যায়।

উপসংহার :

ইলম অনুযায়ী আমল করার এই দীর্ঘ আলোচনা শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে, ইলম তখনই ফলপ্রসূ হয়, যখন তা ইখলাছ ও সুন্নাতের শর্তে পরিশুদ্ধ হয় এবং জীবনের প্রতিটি পাপ থেকে সতর্ক থেকে দ্রুত বাস্তবায়িত হয়। আমাদের জ্ঞানের অহংকার বা আমলের আত্মতৃপ্তি যেন আমাদের ধ্বংস না করে; বরং আমলের ক্ষেত্রে সবসময় আল্লাহ্র তাওফীক্বের উপর নির্ভর করা এবং জ্ঞানের যাকাত স্বরূপ তা জীবনে প্রতিফলিত করাই হ'ল মুমিনের চূড়ান্ত সফলতা। মহান আল্লাহ আমাদের জীবনকে তার সীমাহীন রহমতের বারি ধারায় সিক্ত করুন; আমাদের ইলম ও আমলে অফুরান বরকত দান করুন; অর্জিত ইলমকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের তাওফীক্ব দান করুন; আমাদের যাবতীয় ইবাদত-বন্দেগী কবুল করে জান্নাতুল ফেরদাউসের চিরস্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

---

২৬. মুসলিম, হা/২৭২২; মিশকাত হা/২৪৬০।
২৭. মুসলিম, হা/২৭১৬; মিশকাত হা/২৪৬২।
২৮. তিরমিযী হা/৩৫২২; মিশকাত হা/১০২; সনদ ছহীহ।
২৯. মুসলিম হা/২৬৫৪; মিশকাত হা/৮৯।
৩০. নববী, বুস্তানুল আরেফীন, পৃ. ৫৬।

মুসলিম জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

-*মুহাম্মাদ রাফাত আনাম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খ. বিশেষ উদ্দেশ্য :

১. সৎকর্মশীল মানুষ তৈরী করা : জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির অন্যতম হ'ল সৎকর্মশীল মানুষ গড়ে তোলা । যদি আমরা এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ সুন্নাহ অধ্যয়ন করি, তাহ'লে আমরা এমন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে পারব যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানী, তার প্রভুকে ভয় করে এবং তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন। আল্লাহ বলেন, الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 'আল্লাহ্র নাম স্মরণ করা হ'লে যাদের হৃদয় ভীত হয়, যারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে, ছালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে আমরা যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করে' *(হজ্জ ২২/৩৫)*। তিনি আরো বলেন, 'মুমিন কেবল তারাই, যখন তাদেরকে আল্লাহ্র কথা স্মরণ করানো হয়, তখন তাদের অন্তর ভয়ে কেঁপে ওঠে। আর যখন তাদের উপর তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করে' *(আনফাল ৮/২)*।

আয়াতদ্বয়ে বর্ণিত ব্যক্তিরা হ'লেন সেইসব মুমিন যাদের জন্য শরী'আত নাযিল হয়েছিল। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 'তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পবিত্র করেন। আর তাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। যদিও তারা ইতিপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে ছিল' *(জুমু'আহ ৬২/২)*।

২. ইসলামী পরিবার গঠন করা :

একজন সৎ ব্যক্তি গঠনের পর জীবনের লক্ষ্য হ'ল একটি সৎ পরিবার গঠন করা। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর' *(তাহরীম ৬৬/৬)*। আমরা পবিত্র কুরআনে পরিবারের সাথে সম্পর্কিত বিধান এবং শিষ্টাচার সম্বলিত অসংখ্য সূরা দেখতে পাই। যেখানে পরিবারের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। যেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদির সাথে আচরণ। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরায় পারিবারিক ব্যবস্থার প্রতি এলাহী নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে, পরিবার হ'ল ইসলামী সমাজের ভিত্তি ও মূল। এটি ছাড়া এই সমাজ টিকে থাকতে পারে না।

পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য হ'ল নিম্নলিখিত স্তম্ভগুলির উপর ভিত্তি করে একটি ইসলামী পরিবার গড়ে তোলা:

ক. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকার ও কর্তব্যের উত্তম বিনিময়। আল্লাহ বলেন, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، 'আর স্বামীদের উপর স্ত্রীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/২২৮)*। আর কর্তব্য পালন, অধিকার পূরণ এবং লালন-পালনের প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া।

খ. স্বামীর উপর পরিবারের অভিভাবকত্ব, তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ: আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، 'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য) তাদের মাল-সম্পদ হ'তে ব্যয় করে থাকে' *(নিসা ৪/৩৪)*।

গ. স্ত্রীকে ঘরের অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করা: হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। কাজেই প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। যেমন শাসক তার জনগণের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের দায়িত্বশীল, সে তাদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী স্বামীর গৃহের এবং তার সন্তানের ব্যাপারে দায়িত্বশীল, কাজেই সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ক্রীতদাস আপন মনিবের সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই সে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। শোন! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই স্ব স্ব অধীনস্থদের বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে' (أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)।[1]

ঘ. পিতামাতার কর্তব্য হ'ল তাদের সন্তানদের যত্ন নেওয়া, সঠিক আদর্শ এবং তাদের নীতি ও জাতির ঐতিহ্যের প্রতি তাদের চরিত্র গড়ে তোলা, তাদেরকে বিশ্বাস, সৎকর্ম এবং সদগুণ দিয়ে ঘিরে রাখা, তাদের চারপাশের প্রভাব মোকাবেলায় দৃঢ় থাকা, মিথ্যার কাছে পরাজিত না হওয়া অথবা মিথ্যা বুদ্ধিবৃত্তিক স্রোতের দ্বারা দুর্বল না হওয়া। আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে খেয়ানত করো না এবং

** শিক্ষার্থী, ইইই বিভাগ, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।*

১. *বুখারী হা/২৫৫৬; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

জেনে-শুনে তোমাদের পরস্পরের আমানতসমূহে খেয়ানত করো না। আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পরীক্ষার বস্তু মাত্র। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌র নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার' *(আনফাল ৮/২৭-২৮)*।

৩. সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ করা :

জীবনের তৃতীয় লক্ষ্য হ'ল একটি সৎ ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। সেটা এমন সমাজ যা আল্লাহ্‌র আদেশে প্রতিষ্ঠিত, যা তাঁর সীমানা সমুন্নত রাখে, যা এই পৃথিবীকে আখেরাতের জন্য একটি ক্ষেত্রে পরিণত করে, যার সদস্যরা সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের বন্ধনে আবদ্ধ, যাদের হৃদয় ঐক্যবদ্ধ এবং যাদের প্রচেষ্টা আল্লাহ্‌র ভালোবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য একত্রিত। যেখানে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রকাশ পায় এবং তাঁর কালিমা সুউচ্চ হয় এবং অবিশ্বাসীদের বাক্য অবনত হয়।

আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যারা তাদের দায়িত্ব পালন করে তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী করবেন, তাদের জন্য তাদের দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের ভয়কে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দিবেন। তিনি বলেন, وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা প্রদান করবেন, যেমন তিনি দান করেছিলেন পূর্ববর্তীদেরকে। আর তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি অবশ্যই তাদের ভয়-ভীতিকে নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। (শর্ত হ'ল) তারা কেবল আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপরে যারা অবাধ্য হবে তারাই হবে পাপাচারী' *(নূর ২৪/৫৫)*।

আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ এই সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা নির্দেশ করে। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসূল-কে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীন সহকারে। যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন। যদিও অংশীবাদীরা এটি অপসন্দ করে' *(ছফ ৬১/৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস রাখবে। যদি আহলে কিতাবগণ ঈমান আনত, তাহ'লে সেটা তাদের জন্য কল্যাণকর হ'ত। তাদের কিছু লোক মুমিন ও অধিকাংশ ফাসেক' *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। অর্থাৎ আল্লাহ এই জাতিকে সৃষ্টি করেছেন কেবল তাঁর উপর ঈমান আনার জন্য, তাঁর দিকে অন্যদের ডাকার জন্য, সৎকাজের আদেশ দেওয়ার জন্য এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করার জন্য।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত এই আদর্শ সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ তুলে ধরতে পারি:

(ক) আক্বীদা সংশোধন : এটি আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, শেষ দিবস, তাক্বদীর বিশ্বাসের মাধ্যমে এবং ইবাদত ও লেনদেনের ক্ষেত্রে এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ 'পূর্ব ও পশ্চিমে মুখ ফেরানোটাই কেবল সৎকর্ম নয়, বরং প্রকৃত সৎকর্মশীল ঐ ব্যক্তি, যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্‌র উপর, ক্বিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাগণের উপর, আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহের ও নবীগণের উপর' *(বাক্বারাহ ২/১৭৭)*। হাদীছে এসেছে, একদিন রাসূল (ছাঃ) লোকদের সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কি? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর নবী-রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহ্‌র দর্শন ও পুনরুত্থানের উপর ঈমান আনবে'।[২]

(খ) রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ অনুসরণ :

পবিত্র কুরআন হ'ল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পাঠানো জীবন বিধান, আর রাসূল (ছাঃ) হ'লেন সেই বিধানের জীবন্ত নমুনা। কিভাবে ছালাত পড়তে হবে, কিভাবে মানুষের সাথে লেনদেন করতে হবে, পরিবার ও সমাজে কিভাবে চলতে হবে এই সবকিছুর নিখুঁত উদাহরণ তাঁর জীবনে পাওয়া যায়।

মুসলিমের জীবনে ইবাদত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। তবে সেই ইবাদত হ'তে হবে রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পথ ও পদ্ধতি অনুসারে। তাঁরই আদর্শ অনুসারে। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ, তাদের জন্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। অর্থাৎ একজন মুসলিমের জীবনের লক্ষ্য হ'তে হবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজের জীবন গঠন করা। তাঁর চরিত্র, জীবনদর্শন, দাওয়াহ, ইবাদত, পারিবারিক ও সামাজিক আচরণ সবকিছুই আমাদের অনুসরণীয়। তার সুন্নাহ অনুসরণ ছাড়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব নয়।

---

২. *বুখারী হা/৪৭৭৭, ৫০; মুসলিম হা/৮; মিশকাত হা/১।*

(গ) নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষ অর্জন :

ইসলাম শুধু কিছু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের নাম নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে উত্তম চরিত্রকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই একজন মুসলিমের চরিত্র হবে তার ঈমানের প্রতিচ্ছবি। সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমা, দয়া, বিনয় ও ধৈর্য প্রভৃতি গুণাবলী অর্জন করা জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে নৈতিকতায় সর্বশ্রেষ্ঠ'।[৩] 'পরকালে ভালো আমলের পাল্লা ভারী করার জন্য উত্তম চরিত্রের কোন বিকল্প নেই। তিনি বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না'।[৪] একজন মুসলিমের আচরণ এমন হওয়া উচিত, যা দেখে অন্যেরা শান্তি ও নিরাপত্তা অনুভব করে। তার কথা ও কাজে মিল থাকবে এবং তার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সুন্দর চরিত্রই ইসলামের নীরব দাওয়াত।

(ঘ) ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপন :

আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، 'মুমিনগণ পরস্পরে ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও' *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এক মুমিন আপর মুমিনের জন্যে প্রাচীর, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এই বলে তিনি তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো একটার মধ্যে আরেকটা প্রবেশ করালেন'।[৫]

(ঙ) মানবতার কল্যাণে কাজ করা :

সমাজসেবা এবং মানুষের উপকার করাও ইবাদতের অংশ। একজন মুসলিম শুধু নিজের জন্য কাজ করে না, বরং সমাজ ও মানবতার কল্যাণ সাধনও তার জীবনের একটি বড় লক্ষ্য। যেমন- দরিদ্রকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর খোঁজ-খবর রাখা, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলা ইত্যাদি। একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, সৃষ্টির সেবা করার মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করা যায়। সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ভূমিকা রাখা তার ঈমানী দায়িত্ব। ব্যক্তিগত ইবাদতের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্ব পালন ছাড়া জীবন অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পারস্পরিক সহানুভূতি ও ভালোবাসাকে ঈমানের অংশ বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ 'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পসন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে'।[৬] এটিই সেই সৎ সমাজ যার সদস্য এবং পরিবার ইসলামের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ এবং আদর্শ নীতির সাথে আবদ্ধ, যা এটিকে একটি জীবন্ত বার্তা করে তোলে। এটিই জীবনের তৃতীয় উদ্দেশ্য। এটিই সেই লক্ষ্য যা অর্জনের জন্য আমাদের যথাযথ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। যদি আমরা এটিকে অবহেলা করি, তাহ'লে অন্যায় ব্যাপক আকার ধারণ করবে, বিরোধ দেখা দেবে, বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে যাবে, অবিচার ছড়িয়ে পড়বে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে এবং আল্লাহ্র ক্রোধ তাঁর বান্দাদের উপর নেমে আসবে, যা আকাশ থেকে রহমত রোধ করবে। এরপর মানুষ সংকটের সম্মুখীন হবে, যার পরবর্তী সংকটের দিকে পরিচালিত করবে, সমাজে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অথবা স্বাস্থ্যগত সংকট ইত্যাদি দেখা দেবে।

৫. পরকালীন মুক্তির প্রস্তুতি :

মুসলিম জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল পরকালীন জীবনে মুক্তি বা জান্নাত লাভ করা। দুনিয়ার জীবন পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্র মাত্র। আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর ক্বিয়ামতের দিন তোমরা পূর্ণ বদলা প্রাপ্ত হবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই হবে সফলকাম। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ধোঁকার উপকরণ ছাড়া কিছুই নয়' *(আলে ইমরান ৩/১৮৫)*।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা প্রথমেই বলে দিয়েছেন মৃত্যুর কথা যা হ'তে পরিত্রাণের কোন পথ নেই। সকলকেই এর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। আর সে দুনিয়াতে ভাল-মন্দ যা-ই করুক তাকে তার পরিপূর্ণ প্রতিদান পরকালে দেওয়া হবে।

প্রকৃত সফলতা তারাই অর্জন করতে পারবে যারা দুনিয়াবী জীবনে স্বীয় প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করেছে, ফলে তাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর এটাই হবে প্রকৃত সফলতা।

এই বিশ্বাস একজন মুসলিমকে দায়িত্বশীল বানায়। সে মনে রাখে যে, দুনিয়ার প্রতিটি কাজের জন্য তাকে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এই জীবনের আরাম-আয়েশ, সম্পদ ও ক্ষমতা সবই অস্থায়ী এবং একটি পরীক্ষা মাত্র। তাই সে তার সময়, সম্পদ ও যোগ্যতা এমনভাবে ব্যবহার করে, যা তার পরকালীন জীবনে সাফল্যের কারণ হবে। এই জবাবদিহিতার অনুভূতি তাকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং ভালো কাজে উৎসাহিত করে। দুনিয়ার সব ব্যস্ততার মাঝেও তার মূল লক্ষ্য বা চূড়ান্ত গন্তব্য থাকে আখিরাত। তাই একজন মুসলিমের লক্ষ্য হওয়া উচিত জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত জান্নাত অর্জনের জন্য ব্যয় করা।

---

৩. *বুখারী হা/৩৫৫৯; মুসলিম হা/৮; মুসলিম হা/২৩২১।*
৪. *তিরমিযী হা/২০০২; সনদ ছহীহ।*
৫. *বুখারী হা/৪৮১, ৬০২৬; মুসলিম হা/২৫৮৫; মিশকাত হা/৪৯৫৫।*
৬. *বুখারী হা/১৩; মুসলিম হা/৪৫; মিশকাত হা/৪৯৬১।*

মোদ্দাকথা হ'ল, এই পাঁচটি লক্ষ্য একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাওহীদের বিশ্বাস থেকেই বাকী সবগুলো উৎসারিত হয় এবং পরকালীন মুক্তির আশা সবগুলোকে অর্থবহ করে তোলে।

জীবনের লক্ষ্য অর্জনে যেমন ছিলেন ছাহাবায়ে কেরাম :

জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছিলেন এক অতুলনীয় আদর্শ। তাঁদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালীন জীবনে সফলতা লাভ করা। এই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই তাঁদের প্রতিটি কাজ, চিন্তা ও অনুভূতি আবর্তিত হ'ত।

তারা পার্থিব জীবনের মোহ ত্যাগ করে পরকালীন জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতেন এবং পরকালীন জীবনকেই সবসময় প্রাধান্য দিতেন। তারা জান্নাত লাভের আশায় নেক আমল করতেন। তাদের জীবন ছিল কুরআন ও সুন্নাহ্র পরিপূর্ণ অনুসরণে। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত সবকিছুই কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে পরিচালনা করতেন। তারা ইসলামকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তারা যেখানেই গিয়েছেন, ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন এবং মানুষকে সৎ পথের দিকে আহ্বান করেছেন। তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের আরাম-আয়েশ, সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠিত হননি। তাদের এই ত্যাগ ও কুরবানী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তারা সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকতেন এবং বাতিলের সাথে কখনো আপোস করতেন না। তারা ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এবং ন্যায় ও ইনছাফের প্রতীক।

তাঁরা দুনিয়াকে প্রয়োজন পূরণের স্থান মনে করতেন, কিন্তু একে কখনো অন্তরে স্থান দেননি। তাঁদের কাছে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ছিল খুবই তুচ্ছ। তাঁরা বিশ্বাস করতেন, এই জীবন পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার একটি পরীক্ষাগার মাত্র। তাই তাঁরা সম্পদ উপার্জন করেছেন, কিন্তু এর দাস হননি। ক্ষমতা লাভ করেছেন, কিন্তু ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল আখিরাতের পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। অর্ধ পৃথিবীর খলীফা ওমর (রাঃ)-এর জীবনপরিক্রমা এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য ছাহাবীগণ জান, মাল, সময়, পরিবার সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। দ্বীনের প্রয়োজনে তাঁরা যেমন মক্কার ঘরবাড়ি ছেড়ে হিজরত করেছেন, তেমনি বদর, ওহোদ ও খন্দকের মতো কঠিন যুদ্ধে নিজেদের জীবন বাজি রেখেছেন। আবুবকর (রাঃ) তাবুক যুদ্ধের সময় তাঁর সর্বস্ব দান করে দিয়েছিলেন। তাঁদের এই আত্মত্যাগ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বিপরীতে তাঁদের কাছে পৃথিবীর সবকিছু ছিল মূল্যহীন।

তাঁরা জীবনের লক্ষ্য অর্জনের যাত্রায় একা চলেননি, বরং একতাবদ্ধ হয়ে একটি আদর্শ সমাজ গঠন করেছিলেন। রাসূল (ছাঃ) যখন মক্কার মুহাজির ও মদীনার আনছারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন, তখন আনছার ছাহাবীগণ নিজেদের সম্পদ ও বাড়ির অর্ধেক পর্যন্ত মুহাজির ভাইদের জন্য উৎসর্গ করে দেন, যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁরা একে অপরের দুঃখে সমব্যথী এবং সুখে আনন্দিত হ'তেন। সমাজের দুর্বল, ইয়াতীম ও বিধবাদের প্রতি তাঁদের দায়িত্ববোধ ছিল প্রবাদতুল্য।

ছাহাবীগণ জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য অর্জনে এমন এক সোনালী প্রজন্ম ছিলেন, যাঁদের ঈমান ছিল পর্বতের মতো অটল, রাসূলের (ছাঃ) প্রতি আনুগত্য ছিল নিঃশর্ত, দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল নির্মোহ এবং দ্বীনের জন্য ত্যাগ ছিল সর্বোচ্চ। তাঁদের জীবনের একমাত্র সাধনাই ছিল এমনভাবে জীবনযাপন করা, যেন মৃত্যুর পর আল্লাহ্র সামনে একজন সফল বান্দা হিসাবে দাঁড়াতে পারেন।

উপসংহার :

পরিশেষে বলব, একজন মুসলিমের জীবন একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন। এর ভিত্তি হ'ল আল্লাহ্র একত্ববাদ, চালিকাশক্তি হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ, সৌন্দর্য হ'ল উত্তম চরিত্র, কর্মক্ষেত্র হ'ল সমাজ ও মানবতা এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল পরকালীন মুক্তি। এই সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই মুসলিম জীবনকে অর্থবহ, প্রশান্তিময় ও সফল করে তোলে। ফলে দুনিয়ার জীবনে কষ্ট বা সংগ্রামের মুখোমুখি হ'লেও সে ভেঙে পড়ে না। কারণ সে জানে তার প্রতিটি চেষ্টার পেছনে রয়েছে এক মহৎ উদ্দেশ্য এবং এর প্রতিদান তিনি আল্লাহ্র কাছে পাবেন। তার হৃদয় থাকে স্থির এবং আত্মা থাকে তৃপ্ত। সুতরাং লক্ষ্য-উদ্দেশ্যহীন জীবন কেবল একটি ব্যর্থ জীবনই নয়, বরং এটি মানুষের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। প্রকৃত সফলতা ও শান্তি নিহিত আছে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে আল্লাহ্র নির্দেশনাকে ধারণ করে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবনযাপনের মধ্যে। অতএব দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে যেন আমরা কাজে লাগাই। মহান আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে জীবন পরিচালনার তাওফীক দান করুন-আমীন!

দারুস সুন্নাহ শপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা'লিমী বোর্ড ও কওমী মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি, খেজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল, অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুন :

০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪

অর্ডার করতে ভিজিট করুন : Darus Sunnah Shop

সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ভবন (নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : একটি গভীর ষড়যন্ত্র

*-সাজিদুর রহমান**

ভূমিকা : বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় 'Interfaith Dialogue' বা 'আন্তঃধর্ম সংলাপ' একটি বহুল চর্চিত ও জাঁকজমকপূর্ণ পরিভাষা। এই মতবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি হ'ল পৃথিবীর সব ধর্মই সঠিক। কোন ধর্মই অপর ধর্ম থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। সকল ধর্মই ভালো কথা বলে। সকল ধর্মই শান্তি ও সম্প্রীতির কথা বলে। এর উদ্দেশ্য হ'ল সকল ধর্মের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক ও সহযোগিতা গড়ে তোলা। আন্তঃধর্মীয় সংলাপকে সাধারণভাবে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, শ্রদ্ধা এবং সহযোগিতার একটি ধারণা হিসাবে প্রচার করা হয়। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নব্য ও পরিমার্জিত রূপ। ইদানীং বিভিন্ন মহলে পশ্চিমা মতাদর্শের অনুসারী বুদ্ধিজীবীদের পাশাপাশি ইসলামী লেবাসধারী একশ্রেণীর আলেমের মাধ্যমেও এই 'ইন্টার-ফেইথ' নামক ঈমান হননকারী মতবাদ প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র চলছে। ফলে সাধারণ মুসলমানরা এই গভীর চক্রান্তের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে। বলাবাহুল্য, ধর্মনিরপেক্ষতার ফিৎনার চেয়েও ইন্টার-ফেইথের ফিৎনা অধিক ভয়াবহ ও সূক্ষ্ম। এই প্রতিবেদনে ইন্টার-ফেইথের ইতিহাস, এর পেছনের গোপন ষড়যন্ত্র এবং শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভয়াবহতা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট :

আন্তঃধর্মীয় সংলাপ বা ইন্টার-ফেইথ মুভমেন্টের ইতিহাস খুব বেশী পুরানো নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একে শান্তির ডাক মনে হ'লেও এর শেকড় প্রোথিত রয়েছে পশ্চিমা সেক্যুলার ও খ্রিস্টান মিশনারী চিন্তাধারায়। আধুনিক ইন্টার-ফেইথ আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৮৯৩ সালে আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্ল্ড পার্লামেন্ট অফ রিলিজিয়নস'-এর মাধ্যমে, যেখানে স্বামী বিবেকানন্দসহ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়ে সকল ধর্মকে 'একই সত্যের ভিন্ন রূপ' হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ক্যাথলিক চার্চ তাদের 'দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিল' (১৯৬২-১৯৬৫)-এর মাধ্যমে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি কৌশল পরিবর্তন করে। তারা অনুধাবন করে যে মুসলিমদের সরাসরি খ্রিস্টান বানানো কঠিন। তাই তারা 'সংলাপ'-এর নামে মুসলিমদের ঈমানী তেজ কমানোর সূক্ষ্ম কৌশল গ্রহণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন পশ্চিমা এনজিও এই মতবাদকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে বিপুল অর্থায়ন শুরু করে এবং বিশেষ করে ৯/১১-এর পর সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাতে মুসলিম বিশ্বে এই ঈমান বিধ্বংসী মতবাদ জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা চালানো হয়।[১]

পেছনের গোপন ষড়যন্ত্র ও স্বরূপ :

RAND Corporation-এর ভূমিকা : মুসলিম বিশ্বের ঈমানী চেতনাকে দুর্বল করার নেপথ্যে আমেরিকার প্রভাবশালী থিংক ট্যাংক 'র‍্যান্ড কর্পোরেশন'-এর ভূমিকা অত্যন্ত গভীর ও সুপরিকল্পিত। তারা 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' বা War of Ideas-এর মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক কাঠামো পরিবর্তনের লক্ষ্যে Civil Democratic Islam Building এবং Moderate Muslim Network-এর মতো প্রতিবেদনের মাধ্যমে মুসলিমদের বিভক্ত করার এবং 'মডারেট' বা আধুনিকতাবাদীদের পৃষ্ঠপোষকতা করার কৌশল গ্রহণ করে। এই কৌশলের অংশ হিসাবেই তারা ইন্টারফেইথ ডায়ালগকে ব্যবহার করে রাজনীতিবিমুখ ছূফীবাদ ও পশ্চিমা মূল্যবোধের প্রচার চালায়। মূলত শিক্ষাব্যবস্থা ও সিলেবাস পরিবর্তনের মাধ্যমে মুসলিমদের ঈমানী চেতনা ধ্বংস করে একটি আপোষকামী ও নির্জীব জাতি তৈরি করাই হ'ল এই প্রক্রিয়ায় র‍্যান্ডের মূল এজেন্ডা।

তাওহীদের বিনাশ ও নব্য দ্বীনে ইলাহী : এর মূল লক্ষ্য হ'ল ইব্রাহীমী ধর্ম (Abrahamic Faiths) বা এজাতীয় নামের আড়ালে ইসলাম, খ্রিস্টান ও ইহুদী ধর্মকে একাকার করে ফেলা। এটি মূলত মুঘল সম্রাট আকবরের 'দ্বীনে ইলাহী'র আধুনিক সংস্করণ, যা Humanism বা মানবতাবাদের মোড়কে পরিবেশন করা হচ্ছে।

সত্য ও মিথ্যার সমতাকরণ : ইন্টার-ফেইথের অন্যতম দর্শন হ'ল কোন ধর্মই এককভাবে সত্য নয় অথবা সব ধর্মই সত্য। এটি মুসলিমদের মন থেকে এই বিশ্বাস মুছে দিতে চায় যে, ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন।

আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা নীতি ধ্বংস করা : ইসলামের অন্যতম ভিত্তি হ'ল আল্লাহর শত্রুদের প্রতি বিদ্বেষ এবং মুমিনদের প্রতি ভালবাসা। ইসলামের বিধান হ'ল মুমিনদের সাথে বন্ধুত্ব রাখা এবং কুফর বা শিরকের সাথে আপোষহীন থাকা। কিন্তু ইন্টার-ফেইথ শেখায় যে, ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে সকল ধর্মের সত্যতাকে স্বীকার করতে হবে এবং কাফেরদের সাথেও গভীর বন্ধুত্ব স্থাপন করতে হবে, যা কুরআন নির্দেশনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৩. শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এর ভয়াবহতা : শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তথাকথিত 'ইন্টার-ফেইথ' মতবাদটি ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হিসাবে ঘোষণা দিয়েছেন *(আলে-ইমরান ৩/১৯, ৮৫)* । তাই সকল ধর্মকে সমান ও সত্য মনে করা স্পষ্ট কুফরী এবং আল্লাহর আয়াতের সরাসরি লঙ্ঘন। আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার মিশ্রণ নিষেধ করেছেন *(বাক্বারাহ ২/৪২)*। অথচ এই মতবাদ শান্তির নাম দিয়ে তাওহীদ ও শিরককে একাকার করে ফেলছে। 'ইব্রাহীমী ধর্ম'-এর ধোঁকাপূর্ণ শ্লোগান দিয়ে তারা ইসলাম, ইহূদী ও খ্রিস্টধর্মকে এক সূত্রে গাঁথতে চায়। অথচ ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম *(আলে-ইমরান ৩/৬৭)*। মূলত এই মতবাদটি 'সব ধর্মই সত্য' এই ভ্রান্ত ধারণা প্রচারের মাধ্যমে অমুসলিমদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানো এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির পথ রুদ্ধ করে মুসলিমদের দাওয়াত ও জিহাদের চিরন্তন চেতনা ধ্বংস করার এক গভীর চক্রান্ত।

সঊদী আরবের ইলমী গবেষণা ও ফৎওয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি 'ফৎওয়া লাজনা দায়েমা' 'ইন্টার-ফেইথ' ও একই ধারার 'ইউনিটি অফ রিলিজিয়নস্' সহ এই ধারার সকল মতবাদ ও

**. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, জয়পুরহাট।*

১. Angel Rabasa & others, Building Moderate Muslim Networks, www.rand.org/pubs/monographs/MG574.html; www.pluralism.org/parliament-of-religions-1893

কার্যক্রমকে হারাম বলে ফৎওয়া দিয়েছে। যার সারমর্ম হ'ল إِنَّ الدَّعْوَةَ إِلَى الوَحْدَةِ الدِّيـــنِيَّةِ، أَيِ الدَّعْوَةِ إِلَى تَوْحِيدِ الإِسْلَامِ وَاليَهُودِيَّةِ وَالمَسِيحِيَّةِ دَعْوَةٌ بَغِيضَةٌ، وَالغَرَضُ مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَةِ هُوَ خَلْطُ الحَقِّ بِالبَاطِلِ، وَهَدْمُ الإِسْلَامِ، وَإِضْعَافُ أَرْكَانِهِ الأَسَاسِيَّةِ 'ধর্মে ঐক্যের ডাক অর্থাৎ ইসলাম, ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মকে এক করার আহ্বান একটি বিদ্বেষপূর্ণ আহ্বান। এই আহ্বানের উদ্দেশ্য 'সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করা, ইসলামকে ধ্বংস করা এবং এর মূল ভিত্তিগুলোকে দুর্বল করা'।[২]

রাজনীতিতে ইন্টার-ফেইথ-এর প্রভাব :

বর্তমান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অঙ্গনে ঈমান ও কুফরের আলাদা কোন অবস্থান নেই। রাজনৈতিক নেতারা বলে থাকেন 'ধর্ম যার যার উৎসব সবার'। অন্যদিকে কথিত ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো সকল ধর্মকে একই কাতারে শামিল করতে তৎপর। ভোট পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের ভাষ্যনুযায়ী, 'মোরা একই বৃত্তে দু'টি কুসুম হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়ন মণি, হিন্দু তার প্রাণ'। এই বিষ্ণু, এই কৃষ্ণ, এই মুহাম্মাদ, এই মূসা, এই ঈসা, আমাদের সামনে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতীক'। 'আমরা ইবাদত করি, আর আপনারা পূজা করেন। এটা শুধুমাত্র একটা ভাষার পার্থক্য। কিন্তু কাজ সকলেরই এক' এমন কুফরী বাক্যগুলো প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে তাদের বয়ানে। অথচ এই বাক্যগুলোই তো ঈমান বিধ্বংসী ইন্টার-ফেইথের আহ্বান। নেতা-নেত্রীদের সুন্নাতী ও নূরানী চেহারা মুবারক অমুসলিম ও মুশরিকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও পরিলক্ষিত হয়। ইসলামের প্রতিনিধি দাবী করা এই সমস্ত মডারেট ইসলামিক দলের নেতারা শিরকের আস্তানাগুলোতে গিয়ে ঈমান-শিরক ও কুফরকে একাকার করে ফেলছেন। যা মূলত ইন্টার-ফেইথেরই আহ্বান।

মধ্যপ্রাচ্যে ইন্টারফেইথ এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগ :

২০০৭ সালের ১৩ই অক্টোবর মধ্যপ্রাচ্যের কিছু মুসলিম নেতা ও স্কলাররা সূরা আলে ইমরান ৬৪নং আয়াতের আলোকে একটি খোলা চিঠি 'A Common Word between Us and You' খ্রিস্টান নেতাদের কাছে প্রেরণ করেন। কেমব্রিজ ইন্টার-ফেইথ প্রোগ্রামের পরিচালক ডেভিড এফ.ফোর্ড উক্ত খোলা চিঠি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে।[৩] এটি ইসলামের দাওয়াত নয়, বরং কুরআনের বাণীকে ব্যবহার করে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের নামে ঈমান ও কুফরের মধ্যে পরস্পরের শ্রদ্ধা ও সম্মানের নামে নতুন ধারার ধর্মের সূচনা করার এক রাজনৈতিক চক্রান্ত। মুসলিম নেতাগণ পূর্বে অমুসলিম নেতাদের ঈমান কবুল করার শর্তে খোলা চিঠি প্রেরণ করতেন। কিন্তু আজ অমুসলিম নেতাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে কথিত মুসলিম নেতারা নিজেরাই নিয়োজিত। ২০১০ সালে জর্ডানের বাদশাহ আব্দুল্লাহ ও যুবরাজ গাযী বিন মুহাম্মাদ-এর প্রস্তাবের মাধ্যমে প্রতি ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহকে 'বিশ্ব আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সপ্তাহ' ঘোষণা করা হয়। এই প্রস্তাবটি ছিল আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির বিশ্বব্যাপী সপ্তাহের জন্য জাতিসংঘের একটি উদ্যোগ।[৪]

২. ফৎওয়া নং ১৯৪০২, প্রকাশকাল : ৩১ মে ১৯৯৭ খৃ.।
৩.wikipedia.org/wiki/A_Common_Word_Between_Us_and_You
৪. www.worldinterfaithharmonyweek.com

আমাদের করণীয় : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে মক্কার ধর্মনেতা ও সমাজনেতারা একটি আপোষ প্রস্তাব নিয়ে এসে বলেছিল, 'এসো আমরা ইবাদত করি যার তুমি ইবাদত কর এবং তুমি ইবাদত কর যাকে আমরা ইবাদত করি। আমরা এবং তুমি পরস্পরে সকল কাজে শরীক হই'। তখন সূরা কাফেরূন নাযিল হয় এবং তারা নিরাশ হয়ে যায় *(সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩য় মুদ্রণ ১৬৫-৬৬ পৃ.)*। যেখানে আল্লাহ বলেন, قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ- لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ- وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ- وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ- وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ- لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ- 'তুমি বল! হে অবিশ্বাসীগণ! আমি ইবাদত করিনা তোমরা যাদের ইবাদত কর এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি। আমি ইবাদতকারী নই তোমরা যাদের ইবাদত কর এবং তোমরা ইবাদতকারী নও আমি যার ইবাদত করি। তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন' *(কাফিরূন ১০৯/১-৬)*। এর অর্থ 'তোমাদের কর্মফল তোমাদের এবং আমার কর্মফল আমার' (কুরতুবী)। অথবা 'তোমাদের জন্য তোমাদের শিরক এবং আমার জন্য আমার তাওহীদ' (তানতাভী)।[৫]

প্রতি ছালাতে সূরা ফাতিহায় যেমন আমরা ইহূদী-খ্রিষ্টানদের হ'তে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাই, ঠিক তেমনি জীবনে চলার পথে সকল বিভাগে তাদের তৈরি সকল মতবাদ ও ফাঁদসমূহ হ'তে মুক্ত থাকার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আমাদের একমাত্র পথ ইসলাম। তাই ইসলামের সাথে অন্য কোন ধর্মকে মিলিয়ে ফেলা কখনই কাম্য নয়।

উপসংহার :

ইন্টার-ফেইথ বা আন্তঃধর্মীয় সংলাপ আপাত দৃষ্টিতে শান্তির বার্তা বহন করলেও এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং সুদূরপ্রসারী। এর মূল লক্ষ্য ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে বিলীন করে সকল ধর্মকে একীভূত করে একটি নতুন ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করা। যা মুসলিম উম্মাহর মৌলিক আক্বীদা ও তাওহীদী চেতনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। পশ্চিমা শক্তি ও তাদের দেশীয় দোসরদের মাধ্যমে পরিচালিত এই ফিৎনা মোকাবিলায় মুসলিম উম্মাহকে গভীরভাবে সচেতন হ'তে হবে। ইসলামী শরী'আতের ফৎওয়া অনুযায়ী এই মতবাদ সম্পূর্ণ হারাম ও ঈমান বিধ্বংসী। মুসলিম হিসাবে আমাদের কর্তব্য হ'ল একমাত্র সত্য ধর্ম ইসলামের স্বকীয়তা বজায় রাখা এবং সর্বাবস্থায় কুফর ও শিরকের সকল প্রকার চক্রান্ত থেকে নিজেদের ঈমানকে রক্ষা করা। মহান আল্লাহ্র বাণী, 'ইহূদী-নাছারারা কখনোই তোমার উপর সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ কর। বলে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দেখানো পথই সঠিক পথ। আর যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তোমার নিকটে (অহি-র) জ্ঞান আসার পরেও, তাহ'লে আল্লাহ্র কবল থেকে তোমাকে রক্ষা করার মত কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। দয়াময় আল্লাহ এই ফাঁদ হ'তে আমাদের ঈমানকে হেফাযত করার ও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর তাওফীক দান করুন- আমীন!

৫. সম্পাদকীয় : আন্তঃধর্ম শান্তি সম্মেলন, ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল গালিব, মাসিক আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০২১ইং।

আর কত রক্ত প্রয়োজন? কবে আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা?

-ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

১৯০ বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭) দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের পর ভারত ও পাকিস্তান নামের দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতায় বৃটিশ সরকার ভারত ত্যাগে বাধ্য হ'লে অবশেষে বৃটিশ পার্লামেন্টের সিদ্ধান্ত ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের রূপরেখা অনুযায়ী দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে (TWO NATION'S THEORY) ভারতবর্ষ ভাগ করা হয়। একমাত্র ধর্মীয় পরিচয়ের কারণেই বাংলা ও পাঞ্জাবকে সেদিন দু'টুকরো করা হয়। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গকে (বাংলাদেশ) পৃথক করে প্রায় দুই হাযার কিলোমিটার দূরত্বের পাকিস্তানের সাথে 'পূর্ব পাকিস্তান' নাম দিয়ে একীভূত করে দেওয়া হয় ইসলামের কারণেই। যার পথ বেয়েই ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্মলাভ করে। মুসলিম অধ্যুষিত না হ'লে সেদিন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হ'ত না, আর পাকিস্তান না হ'লে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নও থাকত সুদূর পরাহত। সুতরাং ইসলাম-ই ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা। ইসলামের কারণেই আমরা পাকিস্তান পেয়েছিলাম এবং ইসলামের কারণেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি। দুর্ভাগ্য, বর্তমানে বিভিন্ন চেতনার ভিড়ে নতুন প্রজন্ম প্রায় ভুলতে বসেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা কী ছিল। ফলে স্বাধীনতার ৫৪ বছরেও বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পায়নি। পেয়েছে মাত্র একটি ভৌগলিক মানচিত্র।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানী চেতনাহীন ও নীতিভ্রষ্ট শাসকদের শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। সে সময় এ দেশের মানুষ বুকভরা ভালোবাসা নিয়ে ভারতীয় সৈন্যদের স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য স্বাধীনতার পর এই পরম বন্ধু (?) ভারতই বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের উপরে এক জগদ্দল পাথর হয়ে দেখা দেয়। দেশ স্বাধীনের মাত্র এক বছরের মাথায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শান্তিবাহিনী নাম দিয়ে অপতৎপরতা শুরু করে, যা দেশকে অস্থিতিশীল করে তুলে। এই শান্তিবাহিনী গঠন, প্রশিক্ষণ প্রদান ও অস্ত্র সরবরাহ এ সবকিছুর নেপথ্যে ছিল ভারত। ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ করা হয় তথাকথিত 'বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি' নামীয় ২৫ বছর মেয়াদী গোলামী চুক্তি। ১৯৭৫ সালে পটপরিবর্তনের পর শুধু শান্তিবাহিনী নয়, একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করা হয়। বাংলাদেশের অপরাধ জগতের বড় বড় গডফাদারদের অভয়ারণ্য হচ্ছে ভারত। বিগত সাড়ে পনের বছরের ফ্যাসিস্ট ও খুনীদেরও ঠিকানা হয়েছে এই ভারতেই। এ ছাড়া এ যাবত ভারত-বাংলাদেশ যত চুক্তি হয়েছে এর সিংহভাগই ভারতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি (১৯৯৬), ট্রানজিট ও ট্রানশিপমেন্ট চুক্তি (২০১০), বন্দি প্রত্যর্পন চুক্তি (২০১৬), ফেনী নদীর পানি প্রত্যাহার চুক্তি (২০১৯), উপকূলে রাডার নযরদারি চুক্তি (২০১৯), ডিজেল আমদানী চুক্তি (২০২৩), মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার চুক্তি (২০১৮), তিন বিঘা ও দহগ্রাম করিডোর (২০২১) প্রভৃতি সকল চুক্তিই হয়েছিল ভারতের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে। সূত্র মতে, বিগত সরকারের আমলে ২০১০ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ২০টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, আর সমঝোতা স্মারক সই হয় ৬৭টি। ফলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী হাসিনা ক্ষমতায় থাকাকালীন বলতে বাধ্য হন, 'আমরা ভারতকে যা দিয়েছি তা ভারত সারাজীবন মনে রাখবে'। বাস্তবে মনেও রেখেছে। আর এ কারণেই বিগত সাড়ে পনের বছরের ফ্যাসিবাদের নায়ক-নায়িকা ও গুম-খুনের কারিগরদের জামাই আদরে আশ্রয় দিয়ে ষোলআনা প্রতিদান দিয়েছে ভারত।

বিগত ৫৪ বছরে ভারত বাংলাদেশে তার আধিপত্যের ষোলকলা পূর্ণ করেছে। ভারতীয় পরোক্ষ প্রেসকিপশনে চলেছে দেশ। বাজার নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মঞ্চ সবজায়গাতেই ছিল দিল্লীর দাদাগিরি। গঙ্গাসহ ৫৪টি নদীর উজানে বাঁধ দিয়ে ভারত বাংলাদেশকে ডুবিয়ে ও শুকিয়ে মারছে ফি বছর। সীমান্তে নিরপরাধ বাংলাদেশীদের পাখির মত গুলি করে হত্যা করছে মাঝে মধ্যেই। ভারতীয় পণ্যে সয়লাব আজ বাংলাদেশ। মার্কেটে গেল যা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যায়। যে কোন পণ্যে হাত দিবেন, দেখবেন এটি ইন্ডিয়ান। অথচ লাভ-লোকসানের দোলাচলে আমাদের দেশীয় ইন্ডাস্ট্রিগুলো মুখ থুবড়ে পড়েছে। এমনকি সীমান্তের ওপারে ফেনসিডিল কারখানা বানিয়ে দেদারসে বাংলাদেশে ফেনিসডিল পাচার করে এ দেশের তরুণ ও যুবসমাজকে ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের প্রান্তসীমায় পৌছে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত এ দেশটি। অপরদিকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ অস্ত্র পাচারের মাধ্যমে একশ্রেণীর উশৃংখল যুবককে সন্ত্রাসী বানানো হচ্ছে। এককথায় বাংলাদেশ হচ্ছে কার্যত ভারতের একটি কলোনী, একটি নিরাপদ বাজার। অথচ আমাদের ক্ষমতালোভী স্বার্থান্ধ নেতারা ভারতের লেজুড়বৃত্তি করে ক্ষমতায় টিকে থাকায় ছিল ব্যস্ত। ফলে তাদের যবানে প্রকৃত আযাদীর বাণী শুনা যেত না। দেশের জন্য মেকি ভালোবাসা ছাড়া তাদের কিছুই ছিল না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দীর্ঘ ৫৪ বছরে মোটা দাগে ১৫ বার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। সংসদীয় পদ্ধতি, রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা, সামরিক শাসন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও অন্তর্বর্তী সরকার সব আমলের অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছে এদেশের জনগণ। দেখেছে বড় দুইটি অভ্যুত্থান। ৯০য়ে এরশাদের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান এবং ২৪শে হাসিনার ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। প্রত্যক্ষ করেছে একাধিক সামরিক শাসন এবং তত্ত্বাবধায়ক ও অন্তবর্তী সরকারের শাসনামল। এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে বহুবার। বায়ান্ন, একাত্তর, নব্বই ও চব্বিশ যার জ্বলন্ত উদাহরণ। এছাড়াও লগি-বৈঠার তাণ্ডব এবং ওয়ান-ইলেভেনও (১/১১) প্রত্যক্ষ করেছে দেশবাসী।

বিগত সাড়ে পনের বছরের আয়নাঘরের নির্মমতার ইতিহাস বিশ্বইতিহাসের সমস্ত নির্মমতাকে যেন হার মানিয়েছে।

অবশেষে সহস্রাধিক তরতাজা প্রাণের বিনিময়ে জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে এ দেশের ছাত্র-জনতা সাড়ে পনের বছরের ফ্যাসিবাদের পতন ঘটিয়ে বাংলাদেশ পুনরায় স্বাধীন করে। দেশবাসী স্বপ্ন দেখে নতুন বাংলাদেশের। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়- এরপরও কি এ দেশের মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে? নিরাপদ একটি জনপদ উপহার পেয়েছে? বাকস্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে? রাজপথে নির্বিঘ্নে চলার সাহস পেয়েছে?

জবাব হচ্ছে- না। যদি প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জিত হ'ত, তাহ'লে জুলাই বিপ্লবের অগ্রসৈনিক, তোজোদ্দীপ্ত কণ্ঠস্বর, অকুতোভয় বীর শরীফ ওছমান বিন হাদীকে (৩২) অকালে রাজপথে গুলিবিদ্ধ হয়ে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হ'ত না। গত ১২ ডিসেম্বর শুক্রবার জুম'আর ছালাতের পর ২টা ২৫ মিনিটে বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট রোড সংলগ্ন ডিআর টাওয়ারের সামনে তাকে গুলি করা হয়। মোটরসাইকেলে চড়ে দু'জন আততায়ী খুব কাছ থেকে চলন্ত রিক্সায় থাকা ওছমান বিন হাদীর মাথা বরাবর গুলি করে। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং সেখান থেকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তিন দিন পর ১৫ ডিসেম্বর সোমবার এয়ার এম্বুলেন্সে করে সিংগাপুর নেওয়া হয়। অতঃপর গত ১৮ ডিসেম্বর রাত সাড়ে নয়টার সিংগাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।*

ওছমান বিন হাদী ছিলেন জুলাই বিপ্লবের আইকনিক ফিগার। ভারতীয় আগ্রাসন ও আওয়ামী ফ্যাসিবাদ থেকে জাতীয় মুক্তির লড়াইয়ে অন্যতম নায়ক। হাদী এক দুরন্ত সাহসী ও অকুতভয় দ্রোহের নাম। অন্যায় ও অনিয়মের বিরুদ্ধে এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ছিলেন ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। জুলাই বিপ্লবের পর তরুণ নেতৃত্বের সবাই যখন রাজনৈতিক দল গঠন কিংবা ক্ষমতার বলয়ে ঢোকার চেষ্টা করছেন, তখন ওছমান হাদি নীরবে অন্যরকম এক লড়াই শুরু করেন। তিনি একঝাঁক তরুণকে সাথে নিয়ে 'ইনকিলাব মঞ্চ' নাম দিয়ে কালচারাল ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। তিনি বুঝেছিলেন, বাংলাদেশে ভারতীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় ষড়যন্ত্রের অন্যতম একটি সেক্টর হ'ল এদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গন। সাংস্কৃতিক মঞ্চগুলো ব্যবহার করে ফ্যাসিস্টদের ফিরে আসার ক্ষেত্র তৈরি করা হবে। তাই তাঁর লড়াইয়ের একটি লক্ষ ছিল সাংস্কৃতিক ফ্যাসিস্টদের রুখে দেওয়া। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর এই ইনকিলাব মঞ্চ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক জগতে রীতিমতো ঝড় তুলে দেয়।

ওছমান বিন হাদী ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। মাদ্রাসা থেকে আলিম পাশ করে ওছমান ভর্তি হন ঢাবিতে। ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন তিনি। ছাত্র পড়িয়ে নিজের পড়াশুনার খরচ চালিয়েছেন। একজন আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকাও পালন করেন। একসময় ইংরেজী শেখার কোচিং সেন্টার 'সাইফুরস'-এ শিক্ষকতা করতেন। ইউনিভার্সিটি অব স্কলারস নামে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন। একাধিক বইও লিখেছেন। রাজনীতির মঞ্চে তিনি যেমন ছিলেন তেজস্বী, রাজপথে যেমন আকাশ কাঁপিয়ে দ্রোহের শ্লোগান দিতেন, তেমনি টেলিভিশন টক শো তে যুক্তিনির্ভর আলোচনায়ও খ্যাতি ছিল তাঁর। একই সঙ্গে ছিলেন কবি, ছিলেন আবৃত্তিকার। জন্ম ঝালুকাঠি যেলার নলিছিটিতে। বাবাও ছিলেন আলেম, স্থানীয় এক মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও খতীব।

ওছমান বিন হাদী অল্পদিনেই তাঁর সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা, বলিষ্ঠতা ও আমানতদারিতা দিয়ে কোটি মানুষের মন জয় করেছিলেন। তাঁর দ্ব্যর্থহীন উক্তিগুলো এ দেশের মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে বার বার ঝংকৃত হবে। 'জান দিব, তবুও জুলাই দিব না।' 'আগামী ৫০ বছর বাঁচলাম কোন ইমপেক্ট তৈরি হ'ল না আমাকে দিয়ে, দেশের জন্য, রাষ্ট্রের জন্য, উম্মাহর জন্য। কিন্তু ধরুন আমি পাঁচ বছর বাঁচলাম সেটার মধ্য দিয়ে যদি আগামী ৫০ বছরের ইমপ্যাক্ট তৈরি হয়, তাহ'লে অনেকদিন বেঁচে থাকায় কি সাফল্য বলেন?...আমরা সারা দেশের ৫৬ হাযার বর্গমাইল হাঁটতে চাই। আমরা ইনসাফের চাষাবাদ করতে চাই। একটা স্বাধীন সার্বভৌমত্বের সততার বাংলাদেশ তৈরি করতে চাই'।

একটি টক শো-তে সঞ্চালকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আপনার কি মনে হয়? এই জুলাইয়েও যদি আমরা একটি ইনছাফের রাষ্ট্র বানাইতে না পারি, ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধের রাষ্ট্র, আগামী একশ বছরে কি বাংলাদেশের মানুষ এই রাষ্ট্র বাঁচাইতে গিয়া আর জীবন দেয়ার সাহস করবে?' তিনি বলেন, 'লম্বা সময় রাজনীতি করার জন্য আমরা আসিনি, আমরা রাজনীতির গতিপথ বদলানোর জন্য এসেছি'।

তিনি বলতেন, 'ফ্যাসিজম একটি দল নয়। ফ্যাসিজম একটি মানসিকতা।' 'জীবন মানে শুধু বেঁচে থাকা নয়, মাথা উঁচু করে বাঁচাই জীবন।' 'ভয়কে যদি রাজনীতির ভিত্তি বানানো হয়, তাহলে রাষ্ট্র একদিন জেলখানা হয়ে যাবে।' 'আল্লাহ অন্যায়ের সঙ্গে নেই, এই বিশ্বাসটাই আমার রাজনীতি।'

ওছমান হাদী চেয়েছিলেন এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে, যে বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে মাথা নত করবে না, যে বাংলাদেশ হবে দুর্নীতিমুক্ত, যেখানে সূদ, ঘোষ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, খুন, রাহাজানি ও যুলুমের রাজনীতি থাকবে না। মাত্র ৩২ বছরের জীবনে তিনি দেখিয়ে গেছেন, রাজনীতি মানেই ক্ষমতা নয়, রাজনীতি মানে আদর্শ। কোটি টাকার নির্বাচনী সংস্কৃতির বিপরীতে তিনি শূন্য হাতে মানুষের কাছ গিয়েছেন। মানুষ তাকে বিশ্বাস করেছে, আর সে বিশ্বাসের প্রতিটি পয়সার হিসাব তিনি জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন।

তিনি মৃত্যুকে কখনো ভয় পেতেন না। তিনি বলেন, 'মৃত্যুকে ভয় পাই না, ভয় পাই যদি বেঁচে থেকেও চুপ থাকতে হয়।' তিনি বলতেন, 'মৃত্যুর ফায়ছালা জমিনে না, আসমানে হয়। আমি চলে গেলে আমার সন্তান লড়বে। তার সন্তান লড়বে। যুগ-যুগান্তরে আযাদের সন্তানরা স্বাধীনতার পতাকা সমুন্নত রাখবেই। মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে লাভ নেই। আমরা তো শাহাদতের জন্যই মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে পা রেখেছি।'

তিনি বলেন ‘আল্লাহ ছাড়া এই যমীনের নীচে আর কাউকে ভয় পাইনা। আল্লাহ যতদিন বাঁচিয়ে রাখবেন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং ইনছাফ এবং সততার জন্য লড়াই করব। এই লড়াই আমাদের জিহাদ ইনশাআল্লাহ। আর যদি আমি মরে যাই, আমি শহীদ হয়ে যাই, আমার ডান পাশের ভাই-বোনেরা এই লড়াই যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন চালায়ে নিবে ইনশাআল্লাহ।’

ওছমান হাদীর জনপ্রিয়তা টের পাওয়া যায় তাঁর জানাযায় লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল দেখে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ইতিপূর্বে এত লোকের সমাগম কোন জানাযায় হয়নি। বহু বোন, বহু মা তাঁর বিয়োগ ব্যথায় অঝোর নয়নে কেঁদেছেন। তেমনি একজন নারী ডাক্তারের আড়ষ্ট কণ্ঠের কথাগুলো এটিএন বাংলার ক্যামেরায় ধরা পড়ে। ওছমান বিন হাদীর কবরের কাছে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ‘আমি জানি না বাংলাদেশে আর কতদিন পরে এরকম একজন ওছমান হাদী আসবে? যে আমার কেউ না কিন্তু তার জন্য আমার বুক ভেঙ্গে যাইতেছে, চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে, মুনাজাতে আমার চোখের পানিতে আমার জায়নামায ভিজে যাচ্ছে। আমি জানি না কেন এত কষ্ট মনে হয়। সে আমার কিছুই না, আমার আত্মীয় না, পরিজন না, আমি একজন ডাক্তার, ঢাকা মেডিকেলে চাকুরী করি। তার যে সততা, তার যে সিমপ্লিসিটি (Simplicity), তার যে দেশপ্রেম, সে রয়েছে আমাদের বুকের মধ্যে। তাকে হারানোর পর মনে হচ্ছে যে বুকের ভিতরটা খালি হয়ে গেছে। ওর জন্য অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমি আসলে থাকতে পারছিলাম না, সেজন্য আমি অফিস শেষ করে চলে আসলাম ওর সাথে দেখা করার জন্য। প্রায় আসব এর পর থেকে ওছমানের সাথে দেখা করার জন্য। আমি চাই আমার সন্তানরা ওছমানের মত দেশপ্রেম নিয়ে বেঁচে থাকুক। ৩২ বছর বয়সে সে যা করেছে একটা মানুষ ৮০ বছর বয়সেও তা করতে পারবে না।’

পরিশেষে বলব, ওছমান হাদী যুগ-যুগান্তর ধরে বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জুড়ে সততা ও ইনছাফের জয়গান গেয়ে যাবে। থাকবে বাংলার মুক্তিকামী মানুষের কাছে অমর হয়ে। অতএব আর রক্ত নয়, ওছমান হাদীর সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে আঠারো কোটি মানুষের কণ্ঠে আবারো গর্জে উঠুক এই দাবী, আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা চাই! একটি ইনছাফের রাষ্ট্র চাই! একটি মানবিক মূল্যবোধের রাষ্ট্র চাই!!

‘সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ (বুখারী হা/১৯৫৪)। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ (আবুদাঊদ হা/৪২৬)।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী :জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ জানুয়ারী	১১ রজব	১৭ পৌষ	বৃহস্পতি	০৫:২১	০৬:৪২	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২২	০৬:৪৪
০৩ জানুয়ারী	১৩ রজব	১৯ পৌষ	শনিবার	০৫:২১	০৬:৪২	১২:০৩	০৩:০৫	০৫:২৫	০৬:৪৫
০৫ জানুয়ারী	১৫ রজব	২১ পৌষ	সোমবার	০৫:২২	০৬:৪৩	১২:০৪	০৩:০৫	০৫:২৬	০৬:৪৬
০৭ জানুয়ারী	১৭ রজব	২৩ পৌষ	বুধবার	০৫:২২	০৬:৪৩	১২:০৫	০৩:০৭	০৫:২৭	০৬:৪৮
০৯ জানুয়ারী	১৯ রজব	২৫ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২৩	০৬:৪৩	১২:০৬	০৩:০৮	০৫:২৮	০৬:৪৯
১১ জানুয়ারী	২১ রজব	২৭ পৌষ	রবিবার	০৫:২৩	০৬:৪৩	১২:০৭	০৩:১০	০৫:৩০	০৬:৫০
১৩ জানুয়ারী	২৩ রজব	২৯ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২৪	০৬:৪৪	১২:০৭	০৩:১১	০৫:৩১	০৬:৫১
১৫ জানুয়ারী	২৫ রজব	০১ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:২৪	০৬:৪৪	১২:০৮	০৩:১২	০৫:৩২	০৬:৫৩
১৭ জানুয়ারী	২৭ রজব	০৩ মাঘ	শনিবার	০৫:২৪	০৬:৪৪	১২:০৯	০৩:১৪	০৫:৩৪	০৬:৫৪
১৯ জানুয়ারী	২৯ রজব	০৫ মাঘ	সোমবার	০৫:২৪	০৬:৪৪	১২:১০	০৩:১৫	০৫:৩৫	০৬:৫৫
২১ জানুয়ারী	০১ শা'বান	০৭ মাঘ	বুধবার	০৫:২৪	০৬:৪৩	১২:১০	০৩:১৬	০৫:৩৭	০৬:৫৬
২৩ জানুয়ারী	০৩ শা'বান	০৯ মাঘ	শুক্রবার	০৫:২৪	০৬:৪৩	১২:১০	০৩:১৭	০৫:৩৯	০৬:৫৭
২৫ জানুয়ারী	০৫ শা'বান	১১ মাঘ	রবিবার	০৫:২৪	০৬:৪৩	১২:১১	০৩:১৭	০৫:৪০	০৬:৫৮
২৭ জানুয়ারী	০৭ শা'বান	১৩ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:১১	০৩:১৯	০৫:৪১	০৬:৫৯
২৯ জানুয়ারী	০৯ শা'বান	১৫ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:১২	০৩:২০	০৫:৪৩	০৭:০০
০১ ফেব্রুয়ারী	১২ শা'বান	১৮ মাঘ	রবিবার	০৫:২২	০৬:৪২	১২:১২	০৩:২৩	০৫:৪৪	০৭:০৩
০৩ ফেব্রুয়ারী	১৪ শা'বান	২০ মাঘ	মঙ্গলবার	০৫:২১	০৬:৩৯	১২:১৩	০৩:২৩	০৫:৪৬	০৭:০৪
০৫ ফেব্রুয়ারী	১৬ শা'বান	২২ মাঘ	বৃহস্পতি	০৫:২০	০৬:৩৮	১২:১৩	০৩:২৫	০৫:৪৮	০৭:০৫
০৭ ফেব্রুয়ারী	১৮ শা'বান	২৪ মাঘ	শনিবার	০৫:২০	০৬:৩৭	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৪৯	০৭:০৬
০৯ ফেব্রুয়ারী	২০ শা'বান	২৬ মাঘ	সোমবার	০৫:১৯	০৬:৩৬	১২:১৩	০৩:২৬	০৫:৫১	০৭:০৭
১১ ফেব্রুয়ারী	২২ শা'বান	২৮ মাঘ	বুধবার	০৫:১৮	০৬:৩৬	১২:১৩	০৩:২৭	০৫:৫২	০৭:০৮
১৩ ফেব্রুয়ারী	২৪ শা'বান	৩০ মাঘ	শুক্রবার	০৫:১৭	০৬:৩৪	১২:১৩	০৩:২৮	০৫:৫৩	০৭:০৯
১৫ ফেব্রুয়ারী	২৬ শা'বান	০২ ফাল্গুন	রবিবার	০৫:১৫	০৬:৩৩	১২:১৩	০৩:২৯	০৫:৫৪	০৭:১০

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১	−২
গাযীপুর	+৫	+৪	+২	০	+১
শরীয়তপুর	−১	০	+১	+২	+১
নারায়ণগঞ্জ	−১	০	০	০	−১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+২	+১	+১
কিশোরগঞ্জ	+৮	+৬	+৩	−২	+৩
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২	+১
মুন্সিগঞ্জ	−১	০	০	০	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৪	+৫	+৩
মাদারীপুর	০	+১	+২	+২	+১
গোপালগঞ্জ	+১	+২	+৩	+৪	+২
ফরিদপুর	+৪	+৫	+৬	+৩	+৫

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+৩	+১	০	−১	−১
ময়মনসিংহ	+১	০	−১	−২	−২
জামালপুর	+৪	+২	+১	০	০
নেত্রকোণা	০	−১	−৩	−৩	−৩

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৪	+৫	+৬	+৬	+৫
সাতক্ষীরা	+৩	+৫	+৭	+৮	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৮	+৬
নড়াইল	+২	+৩	+৪	+৫	+৪
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭	+৭	+৬
কুষ্টিয়া	+৩	+৪	+৪	+৫	+৩
মাগুরা	+৩	+৪	+৫	+৫	+৪
খুলনা	+২	+৪	+৫	+৬	+৪
বাগেরহাট	+১	+৩	+৪	+৫	+৩
ঝিনাইদহ	+৪	+৫	+৬	+৬	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	−১	+১	+৩	+৩	+২
পটুয়াখালী	−২	০	+৩	+৩	+২
পিরোজপুর	০	+২	+৪	+৪	+৩
বরিশাল	−১	০	+২	+২	+১
ভোলা	০	০	০	+১	০
বরগুনা	−১	+১	+৪	+৪	+৩

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৩	+৩	+৩	+২	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৫	+৫	+৪
বগুড়া	+৫	+৪	+৩	+৩	+২
রাজশাহী	+৮	+৭	+৭	+৬	+৬
নাটোর	+৬	+৫	+৫	+৫	+৪
জয়পুরহাট	+৭	+৫	+৩	+৩	+৩
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৮	+৭	+৭
নওগাঁ	+৮	+৭	+৫	+৪	+৫

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+১০	+৮	+৪	+৩	+৪
দিনাজপুর	+৯	+৭	+৪	+৪	+৪
লালমণিরহাট	+৭	+৫	+১	০	+২
নীলফামারী	+৯	+৬	+৩	+৩	+৩
গাইবান্ধা	+৫	+৪	+২	+১	+১
ঠাকুরগাঁও	+১১	+৮	+৫	+৪	+৫
রংপুর	+৭	+৫	+২	+২	+২
কুড়িগ্রাম	+৫	+৩	০	০	০

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৪	−৩	−২	−২	−৩
ফেনী	−৫	−৪	−৩	−২	−৪
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	+৫	+৫	+৪	−২	+৩
রাঙ্গামাটি	−৯	−৭	−৫	−৫	−৬
নোয়াখালী	−৪	−৩	−১	−১	−২
চাঁদপুর	−৩	−২	−১	০	−১
লক্ষ্মীপুর	−৩	−২	০	০	−১
চট্টগ্রাম	−৮	−৬	−৩	−৩	−৪
কক্সবাজার	−৯	−৬	−৩	−১	−৪
খাগড়াছড়ি	−৯	−৮	−৬	−৫	−৭
বান্দরবান	০	−৮	−৫	−৪	−৬

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৫	−৬	−৭	−৮	−৮
মৌলভীবাযার	−৫	−৬	−৭	−৬	−৭
হবিগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৫	−৫
সুনামগঞ্জ	−৩	−৪	−৫	−৬	−৬

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

আগামীর নক্ষত্র গড়ে উঠুক বিনয়ের আলোয়!

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

পিতা-মাতার কাছে সন্তান কেবল রক্ত-গোশতের কোন শরীর নয়; সন্তান হ'ল তাদের অস্তিত্বের অংশ, স্বপ্নের চারাগাছ এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সেতুবন্ধন। প্রত্যেক পিতা-মাতা চান সন্তান বড় হয়ে অনেক বড় কিছু হবে, সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। বড় আলেম, বড় ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি হবে। কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবেছি, আমার সন্তান যত বড়ই হোক না কেন, তার মধ্যে যদি 'বিনয়' না থাকে, তবে সে সমাজের জন্য কতটা ভয়ংকর হ'তে পারে?

যে গাছে ফল বেশী ধরে, সে গাছ মাটির দিকে ঝুঁকে থাকে। ঠিক তেমনি যে মানুষের জ্ঞান ও যোগ্যতা যত বেশী তার বিনয় তত গভীর হওয়া উচিত। আজকের এই তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে আমরা সন্তানদের ফাস্ট হ'তে শেখাই, স্মার্ট হ'তে শেখাই, কিন্তু মানুষ হ'তে শেখাতে ভুলে যাই। সন্তানদের 'সাফল্য' বা 'ক্যারিয়ার' নিয়ে আমরা যতটা চিন্তিত, তাদেরকে 'মানুষ' হিসাবে গড়ে তোলার ব্যাপারে ততটা মনোযোগী নই। ফলে তারা বড় হয়ে সফল হয় ঠিকই, কিন্তু তাদের অহংকারের দাপটে পরিবার ও সমাজ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। আপনার সন্তানকে একজন বিনয়ী, পরোপকারী ও পরিশুদ্ধ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চাইলে নিম্নের বিষয়গুলো আজ থেকেই চর্চা শুরু করুন।

১. আপনিই তাদের আয়না, তাই নিজে বিনয়ী হোন!

সন্তানকে শুধু বইয়ের পৃষ্ঠা পড়িয়ে 'মানুষ' বানানো যায় না। তাকে মানুষ বানাতে হ'লে নিজেকেও একজন খাঁটি মানুষ হিসাবে তার সামনে উপস্থিত হ'তে হবে। শিশুরা নছীহত শুনে যা শেখে, তার চেয়ে হাযার গুণ বেশী শেখে পিতা-মাতার আচরণ দেখে। আপনি যদি বাসার কাজের লোক, রিকশাচালক বা অধীনস্থদের সাথে ধমক দিয়ে কথা বলেন, আর সন্তানকে বলেন, সবার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তা কখনোই কাজে আসবে না। তাই সন্তানের সামনে উঁচু-নীচু ভেদাভেদ ভুলে সবার সাথে কোমলভাবে ও সম্মান দিয়ে কথা বলুন। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি নয় বছর রাসূল (ছাঃ)-এর সেবায় নিয়োজিত ছিলাম। কিন্তু আমার জানা নেই যে, কোন কাজ আমি করেছি, অথচ তিনি সে ব্যাপারে বলেছেন, এরূপ কেন করলে? কিংবা কোন কাজ করিনি, সে ব্যাপারে বলেছেন, কেন অমুক কাজটি করলে না।[১]

পরিবারের ভেতরে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যথাযথ সম্মান করুন এবং গৃহের মুরব্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখুন। সন্তান যখন দেখবে আপনারা বড়দের সম্মান করছেন, সেও তা শিখবে। নিজের ভুল হ'লে সন্তানের সামনেই বিনয়ের সাথে 'সরি' বা দুঃখিত বলুন। এতে তারা শিখবে যে, ভুল স্বীকার করলে কেউ ছোট হয়ে যায় না, বরং এতে সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

২. 'শুকরিয়া' ও কৃতজ্ঞতার সংস্কৃতি

আজকের শিশুরা অনেক কিছুই না চাইতেই পেয়ে যায়। ফলে তাদের মধ্যে পাওনাদার মনোভাব তৈরী হয়। তারা ভাবতে শুরু করে, সবকিছু পাওয়া আমার অধিকার। এই মনোভাবই অহংকারের মূল।

তাই সন্তানকে শেখান যে, সে যা খাচ্ছে, পরছে বা ব্যবহার করছে- তা তার কোন কৃতিত্ব নয়, বরং আল্লাহ্র দয়া এবং পিতা-মাতার পরিশ্রমের ফল। ছোটখাটো যেকোন প্রাপ্তিতে আলহামদুলিল্লাহ এবং কারও কাছ থেকে ছোট কোন সাহায্য পেলেও সন্তানকে 'ধন্যবাদ' বা 'জাযাকাল্লাহ' বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শেখান। কৃতজ্ঞতা অহংকারের সবচেয়ে বড় প্রতিষেধক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতিও শুকরিয়া আদায় করে না'।[২]

৩. নিজের কাজ নিজে করতে অভ্যস্ত করুন!

সন্তানকে রাজপুত্র বা রাজকন্যার মতো বড় করবেন না। যে নিজের কাজ নিজে করতে জানে না, সে অন্যকে ছোট মনে করতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের জুতায় নিজে তালি লাগাতেন, কাপড় সেলাই করতেন, ঘরের কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন।[৩]

তাই সন্তানকে তার নিজের স্কুলব্যাগ বহন করতে দিন। খাওয়ার পর নিজের প্লেটটি ধুয়ে রাখার অভ্যাস করান। নিজের কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করতে অভ্যস্ত করুন। নিজের বিছানা গোছানোর দায়িত্ব তাকেই দিন। পারিবারিক নানা কাজ করিয়ে নিন। এতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠবে। তাদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা ও বিনয় তৈরি হবে।

৪. মানুষের সাথে মেশার সুযোগ দিন!

আপনার সন্তান যদি সারাক্ষণ ঘরে আটকে থাকে, গভীর অধ্যয়নে মত্ত থাকে এবং শুধু নিজের স্ট্যাটাসের বন্ধুদের সাথেই মেশে, তবে সে দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝবে না। সে গরীব বা সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করতে শিখবে। তাই মাঝে মাঝে তাকে নিয়ে গ্রামে যান, আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজ নিতে বলুন। সবার সাথে মিশতে অভ্যস্ত করুন। ইয়াতীমখানা বা বস্তিতে নিয়ে যান। নিজের হাতে গরীব-অসহায়দের দান করতে শেখান। যখন সে দেখবে, তার বয়সের অন্য শিশুটি একবেলা খাবারের জন্য কি সংগ্রামই না করছে, তখন তার মন নরম হবে এবং আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হবে।

৫. সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত করুন!

আধুনিক যুগে পিতামাতারা অনেক সময় ভালোবেসে সন্তানকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিলাসিতা দিয়ে ফেলেন। এতে সন্তানের মধ্যে অহংকার তৈরি হ'তে পারে। তাই তাকে সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত করুন। সবসময় ফাস্ট ফুড বা দামী

---

১. মুসলিম হা/২৩০৯।

২. আবূদাঊদ হা/৪৮১১; ছহীহাহ হা/৪১৬।

৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৪৪০।

খাবারের পরিবর্তে ঘরে তৈরি সাধারণ খাবার খাওয়ান। তাকে বোঝান যে, খাবার হ'ল আল্লাহ্র নে'মত এবং শরীরের প্রয়োজন, বিলাসিতার বস্তু নয়। ক্ষমতা থাকলেও সবসময় ব্যক্তিগত গাড়ি বা দামী বাহন ব্যবহার না করে মাঝে-মধ্যে ভ্যান-রিকশা সহ গণপরিবহনে চড়ার অভিজ্ঞতা দিন। অল্প দূরত্বে হেঁটেই কাজ সারার মানসিকতা তৈরি করুন। এতে সে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সাথে মেশার সুযোগ পাবে এবং বাস্তবতা বুঝতে শিখবে। দামী ব্র্যাণ্ডের পোশাক বা লেটেস্ট মডেলের গ্যাজেট থাকলেই যে মানুষ বড় হয় না, এই শিক্ষা দিন। পরিচ্ছন্ন ও মার্জিত পোষাকই যে যথেষ্ট, তা তাদের বোঝান। কোনটি তার 'প্রয়োজন' আর কোনটি তার 'বিলাসিতা বা ইচ্ছা' এই দু'টির পার্থক্য বোঝান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্র প্রতি বিনয়বশত মূল্যবান পোষাক পরিধান ত্যাগ করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং ঈমানের পোষাকের মধ্যে যে কোন পোশাক পরার অধিকার দিবেন'।[৪]

৬. তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও তুলনা বন্ধ করুন!

কখনো সন্তানের সামনে অন্য কারো সমালোচনা করবেন না বা কাউকে নিয়ে হাসাহাসি করবেন না। কারো গায়ের রঙ কালো, কেউ দেখতে অসুন্দর কিংবা কারো শারীরিক কোন ত্রুটি আছে এসব নিয়ে সন্তানের সামনে ভুলেও হাসাহাসি করবেন না। বরং তাকে বোঝান, 'আল্লাহ যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, সেটাই সুন্দর।

ওরা গরীব, ওদের সাথে মিশবে না- এই কথাটি সন্তানের মনে অহংকারের পাহাড় তৈরি করে। তাকে শেখান যে দরিদ্রতা কোন পাপ নয় এবং ধনী হওয়া কোন যোগ্যতা নয়। অনেক পিতামাতা ভাবেন, অন্যের সাথে তুলনা করলে সন্তান যেদ করে ভালো ফলাফল করবে। যেমন 'ও ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছে আর তুমি ফেল করেছ'। এই তুলনা সন্তানের মনে হিংসা ও বিদ্বেষ তৈরি করে। সে তার বন্ধুকে আর বন্ধু মনে করে না, বরং প্রতিপক্ষ ভাবে। তাকে বোঝান, প্রত্যেকের মেধা আলাদা। কেউ পড়াশোনায় ভালো, কেউ ব্যবহারে ভালো, আবার কেউ হয়তো হাতের কাজে দক্ষ। অন্যের সাথে তুলনা না করে তাকে 'গতকালকের নিজের' চেয়ে 'আজকের নিজেকে' উন্নত করার শিক্ষা দিন।

৭. সহমর্মিতার শিক্ষা দিন!

এটি বিনয় অর্জনের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম। সন্তান যখন রাস্তায় কোন ভিক্ষুককে দেখবে কিংবা ছিন্নমূল কোন শিশুকে দেখবে, তখন তাকে ঘৃণা করতে দেবেন না। তাকে গভীরভাবে বোঝান- আল্লাহ চাইলে আজ তুমি ঐ অবস্থায় থাকতে পারতে, আর সে তোমার জায়গায় থাকতে পারতো। আল্লাহ তোমাকে ভালো রেখেছেন, এটা তোমার কৃতিত্ব নয়, এটা আল্লাহ্র দয়া।

এই চিন্তাধারাটি সন্তানের মনে কৃতজ্ঞতাবোধ তৈরি করবে। সে ভাববে, আমাকে আল্লাহ অনেক দিয়েছেন, তাই আমার দায়িত্ব হ'ল যাদের নেই তাদের পাশে দাঁড়ানো। এই বোধ থেকেই প্রকৃত মানবিকতার জন্ম হয়।

৮. ভুল সংশোধনে হোন কৌশলী!

সন্তানকে প্রকৃত বিনয়ী রূপে গড়ে তুলতে ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে অভিভাবককে হ'তে হবে অত্যন্ত কৌশলী ও প্রজ্ঞাবান। সন্তানের কোন উদ্ধত আচরণকে যেমন প্রশ্রয় দিয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত, তেমনি সবার সামনে তাকে তিরস্কার করে লজ্জিত করাও হিকমতের পরিপন্থী। কারণ এতে তার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় এবং যিদ বেড়ে যায়। এর পরিবর্তে নিরিবিলি পরিবেশে তাকে স্নেহের সাথে ভুলের স্বরূপ বুঝিয়ে দিন এবং তার অনুভূতির দুয়ার খুলে দিতে প্রশ্ন করুন, তোমার সাথে কেউ এমন আচরণ করলে তোমার কেমন লাগত? এভাবেই তাকে অন্যের জায়গায় নিজেকে রেখে চিন্তা করতে শেখান।

৯. সেবার মানসিকতা তৈরি করুন!

বিনয় চর্চার সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র হ'ল মানুষের সেবা করা। বাসায় মেহমান এলে সন্তানকে বলুন তাদের পানি এগিয়ে দিতে বা নাশতা পরিবেশন করতে। বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য তথা দাদা-দাদী, নানা-নানী বা আত্মীয়-স্বজনের সাথে কেমন আচরণ করতে হয়, কিভাবে তাদের খেদমত করতে হয় তা হাতে-কলমে শেখান। বৃদ্ধদের সেবা করতে তাকে উৎসাহিত করুন। যখন সে নিজের হাতে অন্যকে খাওয়াবে বা সেবা করবে, তখন তার মনের অহংকার গলে পানি হয়ে যাবে। এছাড়া পশুপাখির প্রতি সদয় হ'তে শেখান। অবলা প্রাণীর প্রতি মায়া মানুষকে নিষ্ঠুরতা থেকে দূরে রাখে।

১০. সন্তানের সাফল্যের নানা গল্পের সাথে বিনয় যুক্ত করুন :

সন্তানের প্রতিটি ছোট-বড় অর্জনে প্রশংসার পাশাপাশি তাদের বিনয়ী হ'তে শেখান। যেমন পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রমের স্বীকৃতি দেওয়ার সময়ই স্মরণ করিয়ে দিন যে, এই সাফল্যের পেছনে শিক্ষক, সহপাঠী ও গুরুজনদের দো'আ এবং সর্বোপরি মহান আল্লাহ্র অশেষ অনুগ্রহ রয়েছে। এতে সন্তান শিখবে যে সাফল্য অহংকারের নয় বরং কৃতজ্ঞতার বিষয়। আর এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাদের অহংকারমুক্ত রেখে এমন এক অপরাজেয় যোদ্ধায় পরিণত করবে, যে বিজয়ের শিখরে পৌঁছেও বিনয়ে মাথা নত রাখতে জানে।

১১. ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার মানসিকতা তৈরি করুন!

সন্তানকে কেবল জয়ের মন্ত্র শেখাবেন না, বরং পরাজয়কে হাসিমুখে বরণ করে নেওয়ার শক্তিও তাদের মধ্যে তৈরী করুন। সন্তান যখন ব্যর্থ হয়, তখন সে বুঝতে পারে যে সে ভুলের ঊর্ধ্বে নয় এবং তারও সীমাবদ্ধতা আছে। এই উপলব্ধিই তাদের মনে 'আমিই সেরা' এমন মিথ্যা অহংকার বা দম্ভ জন্মাতে দেয় না। তাদের বোঝান যে, জীবনে হোঁচট খাওয়া মানে হেরে যাওয়া নয়, বরং নিজের ভুলগুলো শুধরে

---

৪. তিরমিযী হা/২৪৮১; ছহীহাহ হা/৭১৮।

নিয়ে নতুন করে শেখার একটি সুযোগ। যে সন্তান ছোটবেলো থেকে ব্যর্থতাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে শেখে, বড় হয়ে সে অন্যের প্রতি অনেক বেশী সহানুভূতিশীল ও বিনয়ী হয়, কারণ সে জানে যে কোন মানুষই নিখুঁত নয়।

১২. দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন!

শুধু কুরআন মুখস্থ করা বা ছালাত আদায় যথেষ্ট নয়। ইবলীসও বড় জ্ঞানী ছিল, কিন্তু শুধু 'অহংকার'-এর কারণে সে বিতাড়িত হয়েছে। তাই সন্তানকে শোনান যে, ফেরআউন ও নমরূদ ধ্বংস হয়েছে তাদের অহংকারের জন্য। কারূণের বিপুল সম্পদ তার কোন কাজে আসেনি। রাব্বুল আলামীন তাকে তার সমস্ত সম্পদ ও বিশাল প্রাসাদ সহ তাকে মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছেন। এসব গল্প তার মনে গেঁথে দিন।

তাকে শেখান যে, অর্থের প্রাচুর্য বা বিত্ত-বৈভব মানুষকে বড় করে না; বরং যার মন যত বিশাল এবং ব্যবহার যত সুন্দর ও বিনয়াবনত সে-ই প্রকৃত ধনী। যে গাছে যত বেশী ফল ধরে, ফলের ভারে সেই গাছটি তত বেশী মাটির দিকে ঝুঁকে থাকে। অথচ ফলহীন গাছ টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ঠিক তেমনি, যারা প্রকৃত জ্ঞানী ও জান্নাতী মানুষ, তারা কখনো অহংকার করেন না; বরং তারা সবসময় বিনয়ী ও নম্র হন। সন্তানকে বুঝান, উদ্ধত হয়ে মানুষের ওপরে থাকার চেয়ে, বিনয়ে মাথা নত করে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়াতেই জীবনের আসল সার্থকতা।

১৩. বিনয়-নম্রতার মর্যাদা অনুধাবন করানোর চেষ্টা করুন!

নিম্নোক্ত হাদীছগুলোতে বিনয়-নম্রতার মর্যাদা সম্পর্কে বলা হয়েছে। যা অনুধাবন করলে সন্তান সদা সর্বদা বিনয়ী হ'তে উদ্বুদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللهُ 'যে বান্দা আল্লাহ্র জন্য বিনীত হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন'।[৫]

তিনি বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ، عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ 'আমি কি তোমাদেরকে জানাব না যে, কারা জাহান্নামের জন্য হারাম বা কার জন্য জাহান্নাম হারাম করা হয়েছে? জাহান্নাম হারাম আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী প্রত্যেক বিনয়ী ও নম্র লোকের জন্য'।[৬]

তিনি আরো বলেন, إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ 'আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালবাসলে তাকে নম্রতা দান করেন'।[৭]

অতএব প্রিয় অভিভাবক! সন্তানকে আলেম, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা ব্যারিস্টার বানানোর স্বপ্ন দেখার আগে তাকে মানুষ বানানোর স্বপ্ন দেখুন। এমন সন্তান গড়ে তুলুন, যে বড় হয়ে বড় কোন চেয়ারে বসলেও তার পা থাকবে মাটিতে। যার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে মানুষ আপনার জন্য দো'আ করবে। আসুন! আমাদের সন্তানদের হৃদয়ে বিনয়ের বীজ বুনে দিই। কারণ বিনয়ী মানুষই আল্লাহ্র কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং আর মানুষের কাছে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়। রাব্বুল আলামীন আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৫. মুসলিম হা/২৫৮৮; মিশকাত হা/১৮৮৯।

৬. তিরমিযী হা/২৪৮৮; ছহীহাহ হা/৯৩৮।

৭. ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৬৬৬।

ডাঃ মোঃ শওকত হাসান

এমবিবিএস (এসএসএমসি)
পিজিটি (ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন)
ডি-কার্ড (কোর্স-কার্ডিওলজি)
হৃদরোগ, মেডিসিন, ডায়াবেটিস চিকিৎসক
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার
এন্ড স্পেশালাইজড হাসপাতাল

১৭০, শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়ক, পুলিশ কোয়ার্টার,
(ফেনী চক্ষু হাসপাতালের পার্শ্বে), ফেনী।
ফোন: ০৩৩১-৬২১১৭, মোবাইল: ০১৯০৫-১১১৬৬৬
০১৯০৫-২২২৭৭৭, ০১৯০৫-৭৭৭১১১

রোগী দেখার সময়
প্রতিদিন সকাল ৯-টা দুপুর ২-টা, বিকাল ৪-টা রাত ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com
রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আদর্শ অভিভাবক

-*সারওয়ার মিছবাহ**

অভিভাবক হিসাবে আমরা আমাদের সন্তানদের কল্যাণ চাই। কল্যাণকামিতায় আমরা সকলেই এক। তবে এই কল্যাণ কতদিনের জন্য হবে বা এটা কেমন পরিসরে হবে সেটা নির্ধারণে আমরা বিভিন্ন চিন্তাধারা লালন করি। কেউ হয়ত শুধু কর্মজীবন পর্যন্ত কল্যাণ চান। কেউ চান দুনিয়াবী জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। কেউ আবার দুনিয়া আখেরাত উভয় জীবনে কল্যাণ চান। এই তিন ধরণের চাওয়ার মধ্যে যারা সন্তানের উভয় জীবনে সার্বিক কল্যাণ চান তারাই প্রকৃতপক্ষে আদর্শ অভিভাবক।

সন্তানের সার্বিক কল্যাণের চিন্তা করে অনেকেই সন্তানকে দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষা দেন। এটাই আপাতত সহজ, পরীক্ষিত এবং নির্ভুল পথ। এছাড়া যারা ভিন্ন পথে চলেছেন তাদেরকে আমরা একসময় আফসোস করতে দেখেছি। অনেকেই একটা সময় নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছেন। আবার অনেকে এই অজ্ঞতার মাঝেই জীবনের সফলতা খুঁজে নিয়েছেন। তাদের বিষয়ে আমরা কথা বলব না। আমরা আজ ঐসকল অভিভাবকের বিষয়ে কথা বলব, যারা সঠিক রাস্তায় এসেও নিজেদের ভুলের কারণে ব্যর্থ হচ্ছেন। আমরা তাদের সমীপে কিছু দিকনির্দেশনা রাখব। যা তাদের সফল অভিভাবক হ'তে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

নিয়তের পরিশুদ্ধতা : সন্তানকে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করার অর্থই তাকে আমি 'ইলমে অহি' শিক্ষা দিতে চাই। এই দুনিয়ায় কোন কাজই উদ্দেশ্য ছাড়া সাধিত হয় না। ঠিক তেমনই ইলমে অহি-র শিক্ষাও উদ্দেশ্যহীন হ'তে পারে না। এর একটি মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হ'ল, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে এই জ্ঞানকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং অপরকে এই জ্ঞান পৌঁছে দেয়া। এই উদ্দেশ্যের বাইরে যা কিছু কামনা করা হোক না কেন সে উদ্দেশ্যে 'ইলমে অহি'র অর্জন মুখ থুবড়ে পড়বে। অভিভাবকও নিজ উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হবেন। সন্তানও তার জীবনে সফলতার দেখা পাবে না।

সুতরাং অভিভাবক হিসাবে আমি প্রথমেই আমার নিয়তকে পরিশুদ্ধ করব। বিভিন্ন আলেমের দুনিয়াবী যশ-খ্যাতি দেখে যদি সন্তানকে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে থাকি তবে সেখান থেকে তওবা করব। কারণ ইলমে দ্বীন দুনিয়াবী যশ লাভের মাধ্যম নয়। হ্যা, আল্লাহ যদি আমার সন্তানকে যশ-খ্যাতি, সম্পদ দান করেন তবে সেটা ভিন্ন বিষয়। এটা তার রিযিকের নির্ধারিত বিষয়। আমার পরিশুদ্ধ নিয়তের মাঝে এগুলো কখনো স্থান নিতে পারবে না। যদি আমার নিয়ত এমন না হয় তবে আমি আদর্শ অভিভাবক হ'তে পারব না।

আমার নিয়তকে শুদ্ধ করার পাশাপাশি সন্তানকেও আমি এই শিক্ষা দেব যে, হে আমার আদরের সন্তান! মনে রাখবে, রিযিক্বের পরিমাণ আসমানে নির্ধারিত হয়। এটার পেছনে ছুটে বেড়ানো মানুষের কাজ নয়। মানুষকে আল্লাহ দুনিয়ায় তাঁর ইবাদতের জন্য প্রেরণ করেছেন। আর রিযিক্বের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। ইবাদতই মানুষের জীবনের মুখ্য কাজ। বাকি সবকিছু এটাকে আরো সবল করার উদ্দেশ্যে করা হয়। অর্থাৎ তুমি খাবার গ্রহণ করবে যেন সেখান থেকে তুমি ইবাদতের শক্তি পাও। তুমি ঘুমাবে যেন ইবাদতের জন্য তুমি রাত্রি জাগরণ করতে পার। তুমি টাকা উপার্জন করবে যেন পারিবারিক সমস্যা তোমার ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে। এই চিন্তাধারা যদি আমি সন্তানের মাঝে দিতে ব্যর্থ হই তবে আমার সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

আমি আমার সন্তানকে বলব, 'হে আমার ছেলে! আমি তোমাকে বড় আলেম বানাতে চাই। তুমি বড় হয়ে দ্বীনের পথে কাজ করবে। তোমাকে দুনিয়াবী কোন কিছু বানানো আমার উদ্দেশ্য নয়। তুমি লেখাপড়া শিখে অনেক অর্থ উপার্জন করবে, এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং তুমি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য তোমার জীবনকে উৎসর্গ করবে। তোমার কাছ থেকে আর্থিকভাবে আমরা উপকৃত হ'তে চাই না। কারণ আমাদের তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ রিযিক্ব আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আমরা তোমার কাছে ছওয়াবের মাধ্যমে উপকৃত হ'তে চাই। আমরা যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব তখন তুমি আমাদের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে পরিগণিত হবে। তোমার সৎ আমলের কারণে আমরা হাশরের ময়দানে সম্মানিত হব। এতটুকুই আমাদের চাওয়া। যদি অভিভাবক ও সন্তান উভয়ের চিন্তাধারা এমন হয় তবে আল্লাহর রহমতে তারা সফল হবে- ইনশাআল্লাহ।

নিজেদের জীবন ইসলামী অনুশাসনে পরিচালনা করা : একজন হাফেয বা আলেমের পিতা-মাতা হওয়ার জন্য কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন আছে। আল্লাহ এমনিতেই আমাদেরকে হাশরের ময়দানে সম্মানিত করবেন না। এজন্য আমাদের নিজেদের জীবনও ইসলামী অনুশাসনের মাঝে পরিচালিত হ'তে হবে। কারণ ইসলামী বিধি-বিধান মানার যে গুরুত্ব রয়েছে তা সন্তান পিতা-মাতাকে দেখেই শিখে। কিন্তু আমাদের পরিবারের মাঝেই যদি ছালাতের গুরুত্ব না থাকে, পর্দার বিধান না থাকে, হালাল-হারামের প্রতি গুরুত্বারোপ করা না হয় তবে আমাদের সন্তান ছোট থেকেই এগুলো হালকাভাবে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে।

সে হয়তো আলেম হবে, কিন্তু ছালাত আদায় করবে না। হালাল-হারাম মানবে না। পর্দা মেনে চলবে না। মোটকথা সে যতই মেধাবী হোক না কেন সে আমলকারী আলেম হয়ে গড়ে উঠবে না। আর এর জন্য দায়ী হব আমরা। ফলে আমাদের সন্তান আমাদের জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়ার মাধ্যমও হবে না। আমরা দুনিয়াতে ক্ষতিস্ত হব, আখেরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত হব। এজন্য সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমলকারী আলেম হিসাবে গড়ে তুলতে নিজ পরিবারে ইবাদতের গুরুত্ব বাড়াতে হবে।

শিক্ষকগণের প্রতি আচার-ব্যবহার : শিক্ষকগণ আমাদের সন্তানদের পথপ্রদর্শক। শিক্ষকগণ তাদের যে পথে পরিচালিত করবেন, তারা সে পথেই পরিচালিত হবে। কোনটি ভাল,

কোনটি মন্দ ইত্যাদির জ্ঞান তারা শিক্ষকগণের কাছেই পায়। আমি যত বড়ই জ্ঞানী হই না কেন, আমি আমার সন্তানের সামনে একজন বাবা বা মা। আমি তার কাছে কখনোই শিক্ষকের ভূমিকায় আসতে পারি না। সন্তান আমার কাছে শিখতে চায় না। সুতরাং শিক্ষক আমার সন্তানকে যে শিক্ষা দান করছেন এটা আমার ও সন্তানের প্রতি তার অনুগ্রহ। এটা সব সময় মনে রাখতে হবে।

এই অনুগ্রহের দিকে লক্ষ্য করে হ'লেও আমাকে শিক্ষকের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করতে হবে। কখনোই তিনি আমার কাছে ছোট নন। তিনি আমার সন্তানের শিক্ষক। এখন আমি যদি তাকে আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে অসন্তুষ্ট করি তবে এর একটি কুপ্রভাব আমার সন্তানের ওপর পড়বে। তিনি আমার সন্তানকে পড়ানোর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। কারণ তিনি আমার মতই মানুষ। রাগ-ক্ষোভ তারও রয়েছে। এগুলো কারণে হয়তো আমার সন্তান ইলমে দ্বীন থেকে মাহরূম হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এই বিষয়গুলো খুব খেয়াল করতে হবে।

সন্তানের খোঁজ-খবর রাখা : রাস্তায় চলাচলের সময় আমরা সাবধানতার সাথে রাস্তা অতিক্রম করি। যেন কোন যানবাহনের সাথে ধাক্কা লেগে দুর্ঘটনার শিকার না হই। আমরা কিন্তু সেখানে বলি না যে 'গাড়ীর চালক তো দেখে চালাচ্ছেন, সুতরাং আমি নিশ্চিন্ত'। সেখানে আমি নিজের সুরক্ষা নিজেই নিশ্চিত করি। কারণ আমি জানি, চালক যদি ভুলে আমার শরীরের ওপর চাপিয়ে দেয় তবে সে ভুল করবে। এই ভুলের জন্য তার শাস্তি হবে, জরিমানা হবে। তবে আমি যে জীবনটা হারাব সেটার ক্ষতিপূরণ হবে না।

ঠিক তেমনই আমার সন্তানকে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেয়ার পরে যদি আমি মনে করি, এখন থেকে সব দায়িত্ব শিক্ষকের, তবে কখনো যদি শিক্ষক তার দায়িত্বে অবহেলা করেন তবে তিনি ভুল করবেন। এই ভুলের জন্য হয়তো তাকে জবাবদিহিতার আওতায় নেয়া হবে। তবে আমার যে ক্ষতি হয়ে যাবে তার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে না। এজন্য সন্তান লেখাপড়া করছে কি-না, তার চারিত্রিক অবস্থা কেমন এগুলো বিষয়ে আমাকেই খোঁজ নিতে হবে। শুধু শিক্ষকের ওপর সমস্ত দায়িত্ব চাপিয়ে নিজে হালকাবোধ করার কোন সুযোগ নেই।

সন্তানের খোঁজ-খবর রাখা অবশ্যই শিক্ষকের মাধ্যমেই হ'তে হবে। অন্যথায় তিনি সন্তানের বিষয়ে দেখ-ভাল করা কমিয়ে দিবেন। সন্তানের ভাল-মন্দের পরামর্শ তার সাথেই করতে হবে। যেন তার এমন মনে হয় যে, অভিভাবক হিসাবে আমি বেশ সচেতন এবং তার সাথে পরামর্শ করেই আমি সন্তানকে পরিচালনা করি। তাহ'লে দেখা যাবে, আমার সন্তানের প্রতি তার সুনযর সৃষ্টি হবে। যা একজন ছাত্রের জন্য বেশ উপকারী।

প্রতিষ্ঠানের নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া : প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের বেতন প্রদান, ছুটি, পরীক্ষা সংক্রান্ত ইত্যাদি বিষয়ে কিছু নিয়ম রয়েছে। সে নিয়মগুলোর সবই যে আমার কাছে যৌক্তিক মনে হবে এমন নয়। কিছু নিয়ম আমার কাছে অযৌক্তিকও মনে হ'তে পারে। তবে কখনোই আমি কোন নিয়মকে ছোট করে দেখব না। হ'তে পারে আমি এমন সেক্টরে কখনো কাজ করিনি বলেই এর প্রয়োজনীয়তা বুঝছি না। আবার এমনও হ'তে পারে যে, আমি একই সেক্টরে কাজ করি তবে আমার প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে পার্থক্য রয়েছে। সুতরাং নিজের অজ্ঞতা মেনে নিয়েই প্রতিষ্ঠানের নিয়মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'তে হবে।

বিশেষত আমি যদি আমার সন্তানের প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল হই, তবে আমাকে নিয়মের প্রতি আরো বেশী শ্রদ্ধাশীল হ'তে হবে। অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের নিয়মগুলো কখনোই প্রতিষ্ঠিত হবে না। নিয়ম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যে পদক্ষেপই গ্রহণ করা হোক না কেন, তা পদে পদে প্রশ্নবিদ্ধ হবে। চাপা সমালোচনার শিকার হবে। আমি তো অভিভাবক হিসাবে আমার সন্তানের অকল্যাণ চাই না, আবার প্রতিষ্ঠানেরও অকল্যাণ চাই না। তবে কেন আমি উভয়কে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেব? এই বিষয়গুলো সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে।

সন্তানকে গুনাহের পরিবেশ ও উপকরণ থেকে রক্ষা করা : সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সন্তান দ্বীনী জ্ঞান ধারণের উপযুক্ত পাত্র হয়ে গড়ে উঠছে কি-না এটা খেয়াল রাখা খুবই দরকার। কারণ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান আল্লাহ কোন গুনাহগারকে দান করেন না। আমরা খেয়াল করে দেখি, আমাদের সন্তান কুরআন-হাদীছ সংক্রান্ত জ্ঞানগুলো অর্জন করতে পারে না। তারা মুখস্থ করে, তবে মনে রাখতে পারে না। বাইরের শিক্ষক রেখেও তাদেরকে পড়াগুলো ষোলআনা বোঝানো যায় না। তখন আমরা হতাশ হয়ে পড়ি। আমরা তাদেরকে আরো পড়ার চাপ দিতে থাকি।

তবে সমস্যা যেখানে, সেখানে হয়তো আমাদের গুরুত্ব পৌঁছাতে পারে না। ঘরে বা বাইরে আমাদের সন্তানদের চোখের হিফাযত হয় না। তাদের কান বাদ্যযন্ত্র থেকে নিরাপদ নয়। তাদের মস্তিষ্ক অপবিত্র চিন্তার নোংরা গুদাম। তবে তাদের মস্তিষ্কে কিভাবে পবিত্র ইলমের জায়গা হবে! সেটা তো প্রতিনিয়ত অপবিত্র অবস্থায় রয়েছে। এদিকে আমার ধারণা হ'ল, বর্তমানের ছেলে-মেয়েরা উঠতি বয়সে স্মার্টফোনের কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তবে আমার ছেলে-মেয়ে ব্যতীত। তারা এমন নয়, তারা খুব ভাল। মনে রাখবেন, সকল অভিভাবকই তাদের সন্তানদের এমনই মনে করেন। পরে যখন দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তখন বুক চাপড়াতে থাকেন। দুর্ঘটনার আগ পর্যন্ত সকলেই নিষ্পাপ থাকে। সুতরাং সন্তানদের গুনাহ থেকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। অন্যথায় আমাদের পরিশ্রম বৃথা যাবে।

সন্তানকে আদব শিক্ষা দেওয়া : সন্তানকে আদব শেখানো আমাদের দায়িত্ব। বড়দের সাথে তার আচরণ কেমন হবে, শিক্ষকের সাথে তার কথা-বার্তা কেমন হবে, বন্ধুদের সাথে সে কিভাবে ওঠা-বসা করবে এগুলো বিষয় শিক্ষাদান করা আমাদের কর্তব্য। আমি যদি তাকে শিক্ষকের প্রতি, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে গড়ে তুলতে না পারি, তবে সে তাদের সাথে ভাল আচরণ করতে পারবে না। এটাই স্বাভাবিক। এজন্য পারিবারিক শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া এবং সেখানে খুব

ভালভাবে আদব শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন, তিনি বে-আদবী সহ্য করতে পারতেন না। বে-আদবী দেখলেই শাস্তি দিতেন। অন্যান্য সকল অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিতেন। তার যুক্তি এমন ছিল যে, একজন শিক্ষার্থীর পড়া না হ'তেই পারে। হয়তো তার মেধা কম। একজন শিক্ষার্থী ক্লাস টাইমে ঘুমাতে পারে। হয়তো সে শারীরিকভাবে দুর্বল। তবে একজন শিক্ষার্থী বে-আদব হ'তে পারে না। কারণ, আদব রক্ষা করার জন্য না মেধার দরকার আছে, না শারীরিকভাবে সবল হওয়ার প্রয়োজন আছে। সুতরাং বে-আদবী কখনোই মানা যায় না।

প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও সুনামকে আমানত মনে করা : সন্তানকে প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করানোর সুবাদে অভিভাবক হিসাবে আমিও প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। এই প্রতিষ্ঠানে যেমন আমার সন্তানের আসা-যাওয়া রয়েছে, তেমনই আমারও এখানে ওঠা-বসা আছে। আমি যখন এই প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে ভর্তি করেছি, তখন এই প্রতিষ্ঠানকে সেরা বিবেচনায় ভর্তি করেছি। পরবর্তীতে যদি কখনো তাদের কোন নিয়ম আমার কাছে অপসন্দ হয় বা আমার সন্তান সেখানে পড়াশোনা করতে ব্যর্থ হয় তখন প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম করার অধিকার আমার নেই। হয়তো এখানে এমন কোন ভেদ রয়েছে, যা বুঝতে আমি সক্ষম নই। অথবা উভয় পক্ষেরই কোন ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। অথবা আমার সন্তানের কোন ভুল হয়েছে তা মমত্ববোধের গাঢ় পর্দা ভেদ করে আমার কাছে প্রকাশিত হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে দ্বীনী স্বার্থকে সামনে রেখে আমরা কখনোই প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম করব না।

কখনো যদি মনে হয়, আমার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, তবে সেই কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকব। প্রতিষ্ঠানের সাথে আমার চোর-পুলিশের সম্পর্ক নয়। এমন নয় যে, প্রতিষ্ঠান আমার কাছে যতটুকু প্রদেয় আদায় করতে সক্ষম হবে ততটুকুই আমি প্রদান করব। বেতন চাইলে আমি দেব, অন্যথায় আমি বেঁচে যাব। সামর্থ্য থাকার পরেও বেতন মওকুফের আবেদন নিয়ে পিড়াপিড়ি করব। এমন ছোট মানসিকতা যেন আমার না থাকে। বরং আমি থাকব প্রতিষ্ঠানের কল্যাণকামী। বেতন দেব, পারলে নফল ছাদাক্বাও করব।

আমার সন্তান যদি প্রতিষ্ঠানের বোর্ডিংয়ে খাবার খায় এবং সেখানে যদি অভিভাবকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা না থাকে তবে আমি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত সিস্টেম ছাড়া বোর্ডিংয়ের খাবার গ্রহণ করব না। কারণ আমি শুধু আমার সন্তানের খাবারের প্রদেয় প্রদান করি। আমি সেই সুবিধাগুলো গ্রহণ করব না যেগুলো বেতনের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠান আমার সন্তানকে প্রদান করে থাকে। তবে কোন প্রতিষ্ঠানে যদি অভিভাবকদের জন্য এই সুবিধাগুলো প্রদান করা হয় তবে সেটা ভিন্ন বিষয়।

আশাকরি, আলোচ্য প্রবন্ধে পূর্ণ রূপরেখা দিতে না পারলেও আদর্শ অভিভাবক হওয়ার জন্য মোটামুটি করণীয় ও বর্জনীয় কিছু বিষয় তুলে ধরতে পেরেছি। এই সবগুলো বিষয় যদি আমরা কর্মে বাস্তবায়ন করতে পারি তবে আমরা আদর্শ অভিভাবক হ'তে পারব ইনশাআল্লাহ। আমরা যতটুকু আদর্শ হব, আমাদের সন্তানরাও ততটুকুই আদর্শ নিয়ে গড়ে উঠবে। তাই আসুন! সন্তানকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য নিজেরা আগে সুপথে পরিচালিত হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া
নরমাল ডেলিভারী ও বন্ধ্যাত্ব রোগে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
CMU (Special Training on TVS)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৭৬৭-৪২৪৬৪৬
যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়
- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।
চেম্বার
ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিকস)
বাড়ী নং ৬২১, শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : দুপুর ৩ টা - রাত্রি ৯ টা
সিরিয়ালের জন্য : ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)
পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।
সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :
স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।
বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।
সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা
মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

ইসলামে শাশুড়ি ও পুত্রবধূর সম্পর্ক

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

স্বামীর পিতা-মাতার খেদমতের প্রয়োজন হ'লে স্বামীর কর্তব্য হ'ল তাদের সেবা-যত্ন করা। তবে কোন স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে, এটা তার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। এর বিনিময়ে সে অনেক ছওয়াব লাভ করে। তবে স্বামীর পিতা-মাতাকে নিজের পিতা-মাতার ন্যায় সম্মান-মর্যাদা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা তার কর্তব্য। মনেপ্রাণে তাদের ভালোবাসা এবং তাদের সেবা-যত্ন করা তার কল্যাণ ও সৌভাগ্যের কারণ হবে। অনুরূপ শ্বশুর-শাশুড়িও পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের মতো আদর-যত্ন ও স্নেহ করবে এবং তার সুখ-সুবিধার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবে। যৌথ পরিবারগুলোতে পুত্রবধূরা শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা-যত্ন করে থাকে। এটা আমাদের সমাজের আবহমান কালের রীতি।

বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়, শ্বশুর-শাশুড়ির সংসার থেকে আলাদা হ'লেও পুত্রবধূ তাদের দেখাশোনা করেন। শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করার এ রীতি ছাহাবায়ে কেরামের জীবনেও দেখা যায়। কাবশাহ বিনতে কা'ব বিন মালেক (রাঃ) ছিলেন আবূ ক্বাতাদা (রাঃ)-এর পুত্রবধূ। কাবশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার আবূ ক্বাতাদা (রাঃ) [কাবশাহর শ্বশুর] ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরে প্রবেশ করে তিনি ওযূর পানি খোঁজ করেন। তখন কাবশাহ (রাঃ) শ্বশুরকে নিজ হাতে পানি ঢেলে দেন।[১]

আবার পুত্রবধূর কোন সন্তান জন্ম নিলে দাদা-দাদী বৃদ্ধ বয়সেও নাতী-নাতনীর জন্য অনেক শ্রম ব্যয় করেন। আদর-যত্নে তাদের দেখাশোনা করেন। এটা তাদের দায়িত্ব না হ'লেও তারা এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। মূলত এক্ষেত্রে নৈতিকতা ও মানবতাবোধের কারণে তারা এরূপ কাজ করেন।

শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কের ব্যাপারটা নতুন কোন বিষয় নয়। মানবসভ্যতার শুরু থেকেই এই সম্পর্ক চলে এসেছে। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আমরা বিভিন্ন মানবিক সম্পর্কের সীমা-পরিসীমা, দায়িত্ব-কর্তব্যের ব্যাপারে জ্ঞান লাভ করি। সঠিকভাবে এ সম্পর্ক লালন করা সবার মানবিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।-

ইসলামে শ্বশুর-শাশুড়ি ও স্বামীর পরিবারের সেবার বিধান :

ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রী তার স্বামীর পিতা-মাতা, ভাই-বোন কারও সেবা করতে বাধ্য নয়। তবে শ্বশুর-শাশুড়ি এবং তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সেবা করা একদিকে যেমন স্বামীর প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে নেকী অর্জনের মাধ্যম। কোন স্ত্রী যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তার শ্বশুর-শাশুড়ি বা তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খেদমত করে তবে আল্লাহ তাকে আখেরাতে পুরস্কার প্রদান করবেন। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে যে যত বেশী মানুষের উপকার করবে সে ততোধিক উত্তম। বিশেষ করে যখন রোগ-ব্যাধি, শারীরিক অক্ষমতা, বয়োবৃদ্ধ হওয়া ইত্যাদি কারণে শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি যত্ন নেওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন কারণে মানুষ একে অন্যের সেবা বা সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়।

এক্ষেত্রে স্বামীদেরও উচিত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় তার শ্বশুর-শাশুড়িদের প্রতি যথাসম্ভব সুদৃষ্টি রাখা এবং প্রয়োজন দেখা দিলে যথাসম্ভব তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা। এতে তিনিও আল্লাহ্র কাছে পুরস্কৃত হবেন ইনশাআল্লাহ।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ وأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ على مُسْلِمٍ أَوْ تَكْشِفُ عنهُ كُرْبَةً أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْناً أَوْ تَطْرُدُ عنهُ جُوعاً ولأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حاجَةٍ أَحَبُّ إِلي من أن أعتكف فِي الْمَسْجِدِ شَهْراً... 'আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক প্রিয় মানুষ হ'ল সে ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হ'ল, একজন মুসলিমের অন্তরে আনন্দ প্রবেশ করানো অথবা তার দুঃখ-কষ্ট লাঘব করা অথবা তার পক্ষ থেকে তার ঋণ পরিশোধ করা অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করা। আর আমার এই মসজিদে (মসজিদে নববীতে) একমাস ব্যাপী ই'তিকাফ করা অপেক্ষা আমার একজন মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মেটানোর জন্য তার সাথে গমন করা আমার নিকট অধিক পসন্দনীয়। যে ব্যক্তি তার ক্রোধ সংবরণ করবে আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। যে ব্যক্তি ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করবে অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তার অন্তরকে সন্তুষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তার সাথে গমন করবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যে দিন মানুষের পাগুলো পিছলে যাবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে যেমন সিরকা (ভিনেগার) মধুকে নষ্ট করে দেয়'।[২]

আমাদের সমাজে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করাকে একজন নারীর প্রশংসনীয় দিক বিবেচনা করা হয়। তাই সামাজিক এই সুন্দর রীতিটি বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। তাছাড়া এটাও মনে রাখা দরকার যে, একজন মহিলার জীবনেও একদিন এমন সময় আসতে পারে যখন তার পুত্রবধূর সেবার প্রয়োজন দেখা দিবে। তাই সে যদি এখন সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় তার শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করে তবে সে যখন শাশুড়ি হবে তখন আশা করা যায়, তার পুত্রবধূরা তার সেবা করবে।

সঊদী আরবের ফৎওয়া বোর্ড শাশুড়িকে সহায়তা করার ব্যাপারে বলেন, ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن

---

১. আবূদাঊদ হা/৭৫, সনদ হাসান ছহীহ।

২. ছহীহুত তারগীব হা/২৬২৩; ছহীহাহ হা/৯০৬; ছহীহুল জামে' হা/১৭৬।

تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة؛ إحساناً لعشرة زوجها، وبرّاً بما يجب عليه بره، 'শরী'আতে এমন কিছু নেই যা নির্দেশ করে যে, স্ত্রী স্বামীর মাকে সাহায্য করতে বাধ্য। তবে স্বামীর প্রতি ইহসান এবং তার প্রতি অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্যপরায়ণতার স্বার্থে যতটুকু সামাজিকতার সীমার মধ্যে পড়ে সেটা ভিন্ন কথা'।[৩]

আল্লামা মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, لا، أم الزوج ليس لها حق واجب على الزوجة بالنسبة للخدمة؛ لكن لها حق مِن المعروف والإحسان، 'না, খেদমতের ব্যাপারে স্ত্রীর ওপর স্বামীর মায়ের কোন হক নেই সামাজিকতা ও ইহসানের হক ছাড়া। এ জিনিসটা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রেম-ভালোবাসা সৃষ্টি করে যে, সে তার মায়ের প্রতি যত্ন নেয়। সাধারণ ছোটখাটো বিষয়ে সেবা করে, মাঝে মাঝে তার সাথে দেখা করে এবং তার বিভিন্ন বিষয়ে তার নিকট পরামর্শ নেয়। কিন্তু তার খেদমত করা আবশ্যক নয়। কারণ সততা ও কল্যাণের সাথে দাম্পত্য জীবন হবে কেবল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে'।[৪]

সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিশেষ নির্দেশনা :

যদি পুত্রবধূ তার শ্বশুর-শাশুড়ির এতটুকু সেবা করে বা কোনভাবে তার উপকার করে তাহ'লে তাদের কর্তব্য, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং তার কাজের মূল্যায়ন করা। স্বামীর কর্তব্য, স্ত্রীর এ কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পাশাপাশি তার প্রশংসা করা এবং তার প্রতি আরও বেশী আন্তরিকতা, যত্ন, সম্মান ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করা। মাঝে মধ্যে এজন্য তাকে আলাদা উপহার দেওয়া। এতে সে খুশি হবে এবং আরও বেশী সেবা দিতে উৎসাহিত হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَم يَشْكُرِ اَلناسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهِ 'যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করল না, সে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা আদায় করল না'।[৫] তিনি বলেন, تَهَادُوا تَحَابُّوا 'তোমরা উপহার বিনিময় কর তাহ'লে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে'।[৬]

কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আমাদের সমাজে শ্বশুর-শাশুড়ি সহ পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি পুত্রবধূর পক্ষ থেকে সেবা পাওয়াকে অধিকার মনে করা হয়। ফলে তার এহেন ত্যাগ ও সেবাকে যথার্থ মূল্যায়ন তো করা হয়ই না; বরং তার কাজে সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি হ'লে তার সাথে নানা অপমানজনক আচরণ করা হয়, তার প্রতি নানাভাবে যুলুম-অত্যাচার করা হয় এবং শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দেওয়া হয়। যা সামাজিক ক্ষেত্রেও অমানবিক এবং শরী'আতের দৃষ্টিতেও নিষিদ্ধ। রাসুল (ছাঃ) বলেছেন, الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ 'এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। কোন মুসলিম অপর মুসলিমের ওপর অবিচার করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং অবজ্ঞা করবে না। আল্লাহ ভীতি এখানে! এ কথা বলে তিনি নিজের বুকের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করে বললেন, একজন মানুষের জন্য এতটুকু অন্যায়ই যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলিম ভাইকে হেয় জ্ঞান করবে। এক মুসলিমের জন্য অপর মুসলিমের রক্ত, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান হারাম'।[৭]

শ্বশুর-শাশুড়িকে অবজ্ঞা করা বা তাদের কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ :

সমাজে কতিপয় মহিলা শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-যোগ্যতা, সৌন্দর্য বা পিতার অর্থ-সম্পদ বা বংশীয় গৌরবের কারণে তার শ্বশুর-শাশুড়ি বা স্বামীর পরিবারকে অবজ্ঞা করে, তাদেরকে নানাভাবে অপমান সুলভ কথা বলে ও কষ্ট দেয়। এটা আদৌ সিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে অনেক স্বামীও তার শ্বশুর-শাশুড়ির সাথে অসদাচরণ করে বা তাদেরকে অপমান-অপদস্থ করে। এটিও নিষিদ্ধ।

সর্বাবস্থায় শ্বশুর-শাশুড়ি সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়ার হকদার। কেননা তারা বয়সে বড়। আর বয়োবৃদ্ধ বা বড়দেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা শিষ্টাচারের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا 'যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের হক বোঝে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।[৮]

সুতরাং প্রতিটি মহিলার জন্য তার শ্বশুর-শাশুড়ি ও তার স্বামীর পরিবারের বড়দের প্রতি যথার্থ সম্মান-শ্রদ্ধা করা এবং ছোটদের প্রতি দয়া ও স্নেহশীল আচরণ করা আবশ্যক। কোন অবস্থায় কাউকে হেয় বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অহংকার প্রদর্শন, অসম্মান জনক আচরণ করা বা কষ্ট দেওয়া জায়েয নয়। নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই কথা প্রযোজ্য।

প্রশ্ন হ'তে পারে পুত্র সন্তানকে জীবিকার্জনের জন্য বাইরে থাকতে হয়। কন্যা সন্তানও বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ি চলে যায়। এ অবস্থায় পুত্রবধূও যদি শ্বশুর-শাশুড়িকে দেখাশুনা না করে তাহ'লে বৃদ্ধ মানুষগুলোকে কে দেখাশুনা করবে?

জবাব হ'ল, আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার সেবা করাকে তার সন্তানদের জন্য অপরিহার্য করেছেন; পুত্রবধূর জন্য নয়। সুতরাং স্বামী পিতামাতার সেবা এবং তার জীবন-জীবিকার মধ্যে সমন্বয় সাধন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে যদি তিনি তার এ দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে না পারেন তাহ'লে এক্ষেত্রে একজন ভালো মনের দ্বীনদার স্ত্রী তার স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং স্বামীকে সহায়তার স্বার্থে তার শ্বশুর-শাশুড়ির যথাসাধ্য সেবা করবে। এতে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন।

---

৩. ফাতাওয়া লাজনাহ আদ-দায়িমাহ, ১৯/২৬৪-২৬৫।
৪. লিকাআতুল বাবিল মাফতুহ, পৃঃ ৬৮, প্রশ্ন নং ১৪।
৫. আহমাদ হ/১১২৮০; তিরমিযী হা/১৯৫৫, সনদ ছহীহ।
৬. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৫৯৪; ছহীহুল জামে' হা/৩০০৪।
৭. মুসলিম হা/২৫৬৪; মিশকাত হা/৪৯৫৯।
৮. আবু দাউদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯২০; ছহীহুল জামে' হা/৬৫৪০।

শ্বশুরবাড়ির সম্পর্ক আবহমানকাল থেকে চলমান। আর বউ-শাশুড়ির ব্যাপারটা যেন আল্লাহ্র কুদরতেরই একটি বহিঃপ্রকাশ। আজ যিনি কন্যা কাল তিনি বধূ। পরশু তিনিই হয়ে যান পরম মমতাময়ী মা। কিছুদিন যেতে না যেতেই তিনি আরেকজন নারীর মা হিসাবে আবির্ভূত হন। সমাজ যাকে শাশুড়ি হিসাবে পরিচয় দেয়। মানবসভ্যতার শুরু থেকেই এই ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। কালের আবর্তে এতে ব্যত্যয় ঘটেনি। ব্যাপারটা নিয়ে নতুন ও আলাদা করে পরিচয় দিতে হয় না। তবে সমাজে সমস্যাটা সৃষ্টি হয় শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা করা নিয়ে। বর্তমানে অধিকাংশ মানুষের মাঝে স্বার্থপরতা, যুলুম, অন্যের ক্ষতি সাধনের মনসিকতা তৈরী হয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের প্রাপ্তি ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু অন্যের পাওনার ব্যাপ্যারে থোড়াই কেয়ার করেন। ভাবখানা এমন যে, নিজের বেলায় ষোল আনা, পরের বেলায় শূন্য আনা।

লক্ষ্যণীয় হ'ল, পুত্রবধূ ও শ্বশুর-শাশুড়ির সম্পর্ক এবং প্রাপ্তিগুলো কখনো একপক্ষীয় নয়; বরং দ্বিপাক্ষিক। শ্বশুর-শাশুড়িকেও নিজেদের কর্তব্য ও অধিকারের সীমারেখা সম্পর্কে জানতে হবে। স্বামীর পিতা-মাতার খেদমতের প্রয়োজন দেখা দিলে, স্বামী নিজে তাদের সেবা-যত্ন করবেন। প্রশ্ন হ'ল- তাহ'লে কি স্ত্রী শ্বশুর-শাশুড়ি কিংবা তার আত্মীয়-স্বজনকে দূরে ঠেলে দিবে? তার কি কোন করণীয় নেই?

মূলত সে শ্বশুর-শাশুড়িকে দূরে ঠেলে দিবে না। বরং তার অবশ্যই কিছু করণীয় আছে। তার উচিত শ্বশুর-শাশুড়ির পরিচয় যথার্থভাবে জানা। তার এই অনুভূতি থাকতে হবে যে, শ্বশুর-শাশুড়ি আমার জীবনসঙ্গী স্বামীর জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারীণী মাতা। যেভাবে আমিও কোন পিত-মাতার সন্তান। কাজেই আমার হৃদয়ে যেভাবে আমার পিতামাতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসা রয়েছে তেমনিভাবে তাঁরও পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্য আছে। স্ত্রীকে সবচেয়ে বেশী যে জিনিসটি খেয়াল রাখতে হবে, তাহ'ল আজকে যেভাবে তারা আমার খেদমতের মুখাপেক্ষী হয়েছেন, বেঁচে থাকলে আমাকেও একদিন শাশুড়ি হ'তে হবে। আজ যদি আমি তাদের খেদমতে নিজেকে ধন্য করি তাহ'লে কাল আমি কিছুটা হ'লেও খেদমত লাভের আশা করতে পারব।

পুত্রবধূর কাছে শাশুড়ির প্রত্যাশা

ভয়, শঙ্কার পাশাপাশি প্রত্যেক নারীর কিছু স্বপ্ন ও আশা থাকে তার শ্বশুরবাড়ি নিয়ে। তদ্রূপ একজন শাশুড়িরও তার পুত্রবধূর কাছে থাকে কিছু প্রত্যাশা থাকে। প্রত্যেক মেয়েই বিয়ের আগে অনেক কিছুই ভাবেন হবু শ্বশুরবাড়ি নিয়ে, শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের নিয়ে, বিশেষ করে শাশুড়িকে নিয়ে। কেমন হবে তার শাশুড়ি মা? কি করে মন জয় করবে তার? এইরকম হাযারো প্রশ্ন থাকে নারীর মনে। এখানে পুত্রবধূর কাছ থেকে শাশুড়ির প্রত্যাশাগুলি উল্লেখ করা হ'ল।-

১. পরিবারকে নিজের ভাবা : শাশুড়ির মন জয় করতে হ'লে কখনও বলা যাবে না আমার পিতার বাড়িটি শ্বশুড়বাড়ি অপেক্ষা ভাল। কারণ শ্বশুরবাড়িটি এখন স্ত্রীর নিজের বাড়ি। সে এই পরিবারের বাইরের কেউ নয়। সুতরাং শ্বশুরবাড়িকে নিজের করে দেখতে হবে এবং নিজের মত করে সাজিয়ে নিতে হবে।

২. স্বেচ্ছায় দায়িত্ব নেওয়া : শাশুড়ি মনে করেন তার পুত্রবধূ আগামী দিনের গৃহকর্ত্রী। তাই তিনি চান তার পুত্রবধূ সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করুক। একসাথে সব কাজের দায়িত্ব নয়, অল্প অল্প করে কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসটি শাশুড়ির বলার আগেই সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে পুত্রবধূর দায়িত্ববোধ ও সংসারের কর্তব্য পালন তাকে শাশুড়ির কাছে প্রিয় করে তুলবে।

৩. সম্মান করা : শাশুড়ি সব সময় পুত্রবধূর কাছ থেকে সম্মান আশা করে থাকে। তাই তাকে সম্মান-শ্রদ্ধা করতে হবে। প্রত্যেক শাশুড়ির থাকে সংসার জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা। সুতরাং তার অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করতে হবে। তার কাছে তার সংসার জীবনের গল্প শুনা, সংসারে কোন সমস্যা হ'লে তাঁর সাথে পরামর্শ করা। এই ছোট ছোট কাজগুলো উভয়ের সম্পর্ককে আরও মযবূত করে তুলবে।

৪. পরিবারে সদস্যদের যত্ন নেওয়া : পরিবারের সকল সদস্যের সাধ্যমত খোঁজ-খবর ও যত্ন নেওয়া। সবার সাথে আন্তরিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করা। এমনকি পরিবারে ছোট সদস্যটির সাথেও সময় করে খেলা করা। এমন কোন কাজ না করা যাতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। পরিবারকে এক রাখার চেষ্টা করা, সেটিকে ভাঙা নয়।

৫. বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া : স্ত্রীর অবশ্যই বোঝা উচিত যে, তার স্বামী শুধু তার একার নয়। তার স্বামী হওয়ার পূর্বেই তিনি তার শাশুড়ির ছেলে। তাই শাশুড়ির অধিকার আছে তার ছেলের উপর। সুতরাং এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পরিবারে চলতে হবে। নিজের অধিকারের সাথে সাথে অন্যের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে।

৬. নিজেকে পরিবর্তন করা : পিতার বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি এক নাও হ'তে পারে। দুই পরিবারের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকতে পারে। নতুন পরিবার ও নতুন পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রয়োজনে শ্বশুরবাড়ির জন্য নিজের কিছু অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে। প্রত্যেক শাশুড়ি চান তার পুত্রবধূ তার পরিবারের জন্য নিজেকে পরিবর্তন করুক।

৭. ছেলেকে ভালো রাখা : প্রত্যেক মা চান তার সন্তান সুখে থাক। শাশুড়ি চান যে, পুত্রবধূ তার ছেলের যথাসাধ্য যত্ন নিক। তাই এ ব্যাপারে যত্নবান হওয়া উচিত। নিজেদের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ ও কথা কাটাকাটি নিজেদের মাঝে রাখতে হবে। নিজেদের বিষয়ে অন্য সদস্যদেরকে জড়ানো যাবে না।

নতুন পরিবেশে নতুন মানুষদের সাথে হঠাৎ করে মিশতে সব মেয়েদের প্রথম প্রথম কষ্ট হয়। তাই একটু বুদ্ধি করে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করতে হবে। শাশুড়ির পসন্দ-অপসন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এভাবে শাশুড়ির চোখেরমণি হয়ে উঠা যায়।

বউ-শাশুড়ি সম্পর্কের রূপরেখা :

পরিবার-পরিজন আল্লাহপাকের দেওয়া এক বিশেষ নে'মত। জন্মসূত্রে পরিবারে সবার আলাদা পরিচয় থাকে। অর্পিত থাকে দায়িত্ব ও কর্তব্য। কুরআন-সুন্নাহ্র বিধান অমান্য কিংবা একচেটিয়া মনোভাব দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করে। শরী'আতের দৃষ্টিতে বউ-শাশুড়ি সম্পর্কের রূপরেখা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

বউ-শাশুড়ি সম্পর্ক : বউ-শাশুড়ির সম্পর্ক হ'তে হবে মা-মেয়ের মতো। একজন স্ত্রীকে স্বামীর মাতা-পিতা তথা শ্বশুর-শাশুড়িকে নিজের পিতা-মাতার মতো সম্মান করতে হবে। মনেপ্রাণে ভালোবাসার নযীর পেশ করতে হবে। অনুরূপ শ্বশুর-শাশুড়িকেও পুত্রবধূর সুবিধা-অসুবিধার প্রতি বিশেষ নযর রাখতে হবে। নিজের মেয়ের মতো ভালোবাসার বন্ধনে আগলে রাখতে হবে। স্ত্রী শ্বশুর-শাশুড়ির কল্যাণেই স্বামীর হাত ধরে নতুন ঠিকানায় আসে। এজন্য বউ-শাশুড়ি পরস্পরকে কৃতজ্ঞ ও সহনশীল হ'তে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ 'যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা আদায় করে না'।[৯]

শাশুড়ি কর্তৃক যুলুম : একজন পুত্রবধূ নিজের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ছেড়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে আসে। সংসারে তার মন বসা কিংবা কাজে-কর্মে দক্ষ হয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগে। মানবিক কারণে তার প্রতি সহানুভূতির হাত সর্বদা ঊর্ধ্বে রাখতে হয়। সামান্য ভুল-ত্রুটির জন্য ঝগড়াঝাটি ও শাশুড়ি কর্তৃক বউকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সম্পূর্ণ অমানবিক। যার শাস্তি অত্যন্ত ভয়াবহ। কথায় কথায় খোঁটা দেওয়া কিংবা ঝগড়াটে বউ-শাশুড়ি কপালপোড়া।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ 'আল্লাহ্র কাছে সেই লোক সর্বাধিক ঘৃণিত, যে অতি ঝগড়াটে'।[১০] তাই উভয়কে ঝগড়াটে মানসিকতা পরিহার করা এবং এমন পরিবেশ যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য উভয়কে সতর্ক ও সচেতন থাকা যরূরী।

পারিবারিক কাজ বোঝা নয় : সাংসারিক কাজ নারীদের দায়িত্ব। এটা কোন অতিরিক্ত বোঝা নয়। এই বুঝ বউ-শাশুড়ির মধ্যে থাকলে অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। ফাতেমা (রাঃ)-এর জীবনী থেকে নারীদের অনেক শিক্ষা রয়েছে। তিনি সংসারের কাজে প্রচুর পরিশ্রম করতেন। আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ফাতেমা (রাঃ) আটা পিষার কষ্টের কথা জানান। তখন তার কাছে সংবাদ পৌঁছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে কয়েকজন বন্দি আনা হয়েছে। ফাতেমা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে একজন খাদেম চাইলেন। তিনি তাকে না পেয়ে তখন তা আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করেন। তারপর রাসূল (ছাঃ) আসলে আয়েশা (রাঃ) তার কাছে বিষয়টি বললেন। আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের কাছে আসলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে উদ্যত হ'লাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাকো। আমি তার পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা যা চেয়েছ আমি কি তোমাদের তার চাইতে উত্তম বস্তুর সন্ধান দেবো না? তিনি বললেন, যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে তখন ৩৪ বার আল্লাহু আকবার, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ বলবে। এই কাজ তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উত্তম যা তোমরা চেয়েছ'।[১১]

শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত : কুরআন ও হাদীছে পিতামাতার খেদমতের দায়িত্ব ছেলেকে দেওয়া হয়েছে। পুত্রবধূর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। তাকে খেদমত করতে বাধ্য করা যাবে না। সে কাজের মেয়ে নয়। তবুও নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শের ভিত্তিতে তাকে শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করতে হয়। এটাকে পরম সৌভাগ্য ও ছওয়াবের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করতে হয়। কেননা শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমতের নমুনা ছাহাবীদের যুগেও ছিল। কাবশাহ বিনতে কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি আবু ক্বাতাদা (রাঃ)-এর পুত্রবধূ ছিলেন। একদা আবু ক্বাতাদা গৃহে আগমন করলে তিনি তাকে ওযূর পানি এগিয়ে দিলেন'।[১২]

স্বামীর আদেশে খেদমত : পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা সবার থাকে। প্রত্যেকটি ছেলে কামনা করে তার স্ত্রী পিতা-মাতার খেদমত করুক। তাদের খেদমতে মনোযোগী স্ত্রী সহজেই স্বামীর হৃদয় জয় করতে পারে। আর স্বামী যদি শরী'আতের মধ্যে থেকে স্ত্রীকে শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমতের আদেশ করে তাহ'লে অবশ্যই স্ত্রীকে স্বামীর আদেশ মানতে হবে। স্বামীর আনুগত্য ছাড়া কোন নারীর ছালাতও কবুল হয় না। আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের কানও অতিক্রম করে না (কবুল হয় না)। ১. পলাতক গোলাম যতক্ষণ না সে (মালিকের কাছে ফিরে আসে)। ২. যে মহিলা স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রিযাপন করে (অথবা স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী যতক্ষণ না তার বাধ্য হয়) ৩. এমন ইমাম মুছল্লীরা যাকে অপসন্দ করে'।[১৩] উল্লেখ্য, বউ-শাশুড়ির সুন্দর সম্পর্কের পেছনে পুরুষদেরও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের মধ্যেকার সম্পর্কোন্নয়নে সচেষ্ট হ'তে হবে। উভয়কে নছীহত করে তাদের মধ্যে বিরাজমান দূরত্ব কমিয়ে আনতে হবে। তবেই সুখী হয়ে ওঠবে প্রতিটি পরিবার।

সারকথা :

পুত্রবধূ ও শাশুড়িদের জন্য আমাদের পরামর্শ হ'ল যে, উভয়ের প্রাপ্য বুঝে একে অপরের কর্তব্য পালন করলে পরিবার সুখী-সুন্দর হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। প্রত্যেকের মাঝে ত্যাগ, পরোপকার এবং অন্যের হকের ব্যাপারে সজাগ-সচেতন থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!

---

৯. তিরমিযী হা/১৯৫৫; মিশকাত হা/৩০২৫; ছহীহাহ হা/৬৬৭।
১০. বুখারী হা/২৪৫৭; মুসলিম হা/২৬৬৮; মিশকাত হা/৩৭৬২।
১১. বুখারী হা/৩১১৩; মুসলিম হা/২৭২৭; মিশকাত হা/২৩৮৭।
১২. আবু দাঊদ হা/৭৫, সনদ হাসান ছহীহ।
১৩. তিরমিযী হা/৩৬০; ছহীহাহ হা/২৮৮; মিশকাত হা/১১২২।

ইবাদতে লৌকিকতা

*-সারওয়ার মিছবাহ**

কিছু দুঃখ আছে যা সকল খুশিকে ম্লান করে। কিছু ক্ষত আছে যা সকল চিকিৎসাকে হার মানায়। কিছু লুকানো যন্ত্রণা আছে যা সকল আনন্দকে নষ্ট করে ফেলে। আজ এমনই একটি লুকানো ঘাতকের কথা বলব। যা আমার প্রতিটি সফলতার ধাপকে ব্যর্থতায় রূপান্তর করেছে। আমার সযত্নে করা নেকীগুলোকে গুনাহে বদলে দিয়েছে। শত যুদ্ধের পরেও আমি যার সাথে পেরে উঠিনি। আমার সেই লৌকিকতা, নিয়তের কদর্যতা। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, 'অনেক তুচ্ছ আমল রয়েছে, যা সৎ নিয়তের কারণে (নেকী লাভের দিক দিয়ে) বৃহদাকার ধারণ করে। আবার অনেক বড় বড় আমল রয়েছে যা নিয়তের কারণে তুচ্ছ বিষয়ে পরিণত হয়'।[১] এভাবেই লৌকিকতা আমার নেকীর পাহাড়গুলো বসন্ত কালের শিমুল তুলার মত উড়িয়ে দিয়েছে।

দুনিয়ায় আজ মুমিনের চেয়ে কাফেরের সংখ্যা বেশী। এর মাঝেই আবার অনেক মুসলমান আছে যারা শুধু সংখ্যায় গণ্য। তাদের মাঝে মুসলমানিত্ব বলতে কিছুই বাকী নেই। যাদের মাঝে কিছুটা বাকী আছে তাদের মাঝে আবার কত দল, কত মত। মুসলমান দাবীদার অধিকাংশই আবার ইবাদত থেকে গাফেল। তারা কখনো মসজিদেই যায় না। ছিয়াম পালন করে না। দান-ছাদাক্বা করে না। খুব অল্প মানুষ রয়েছে, যারা আল্লাহ্র ইবাদত করে। মসজিদে যায়। ছিয়াম পালন করে, ছাদাক্বা করে। শতকরায় হিসাব করলে তারা দু'জনের বেশী নয়। আমি শুকরিয়া আদায় করছি, কারণ আমিও তাদের মাঝেই একজন। ভেতর থেকে আমি যেমনই হই, মানুষ আমাকে ইবাদতগুযার বলে। ভালো বলে।

এই সবকিছুর পরেও একাকীত্বে আমার অন্তর যেন আমাকে ধিক্কার দেয়। এজন্য আমি একাকীত্বকে ভয় করি। নীরবতাকে ভয় করি। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে নিশ্চুপ হয়ে চোখ বন্ধ করতে ভয় করি। কারণ তখন আমার ভেতর থেকে কেউ যেন আমাকে খুব অপমান করে। আমাকে অনেক এমন বিষয় প্রশ্ন করে, যার উত্তর আমি দিতে পারি না। সে আমাকে প্রশ্ন করে, তোমার বয়স কত হ'ল? আর কতদিন তুমি নির্লজ্জ থাকবে? তুমি কি তোমার আমলনামা লোক-সম্মুখে পড়ার সাহস রাখ? সেখানে এসব কি লেখা? সে আমাকে পড়ে পড়ে শোনায়।

সে আমাকে বলে, তুমি তো লোকসম্মুখে তোমার জিহ্বা যিকিরে সিক্ত রাখ, কিন্তু তোমার একাকীত্বগুলো এত নোংরা কেন? তোমার কথা শুনলে তো মনে হয়, তুমি আখেরাতমুখী মানুষ। অন্তরালে তোমার চোখ দু'টো দুনিয়ার লোভে এত চকচক করে কেন? তোমার বক্তব্য শুনে তো মানুষ ইখলাছের শিক্ষা নেয়। কিন্তু তোমার আমলনামায় লোক দেখানো ইবাদত ছাড়া কোন আমলই নেই! যেখানে তোমাকে কেউ চেনে না সেখানে তুমি ফরয ছালাতও ঠিকমত আদায় কর না। পরিচিতদের মাঝে এলেই তোমার আমল বেড়ে যায় কেন? রুকূ-সিজদা এত দীর্ঘ হয় কেন? তুমি তো সম্পদের যাকাতই আদায় কর না। আবার লোকসম্মুখে নফল ছাদাক্বায় এত দানবীর সাজ কেন?

তুমি কি ঐ হাদীছটি পড়নি, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম একজন আলেম, শহীদ ও দানশীলকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২] কারণ তাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ ছিল না। তুমি কি কুরআন পড়নি, যেখানে আল্লাহ বলছেন, তার কাছে রক্ত গোশত কিছুই পৌঁছে না। কেবল তোমাদের তাক্বওয়া পৌঁছে। হাতেম (রহঃ) বলেছেন, নিজ আত্মাকে তিনটি বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ করে নাও। যখন কোন কাজ করবে, তখন স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। যখন কোন কথা বলবে, স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তা শুনছেন। আর যখন চুপ থাকবে, তখন স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ তোমার সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।[৩] তুমি কি আমার সাথে সেভাবে চুক্তিবদ্ধ হয়েছ?

তুমি কেমন আলেম, যার ইলম তার আমলে কোন পরিবর্তন আনে না? হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'লোক দেখানো ব্যক্তির চারটি আলামত হ'ল- (১) একাকী থাকা অবস্থায় সে (সৎ আমলে) অলসতা করে (২) মানুষের সাথে থাকলে সে তৎপর হয় (৩) সে কাজ বেশী করে যখন কাজের জন্য তার প্রশংসা করা হয় (৪) আর তা কম করে যখন সেজন্য তাকে নিন্দা করা হয়'।[৪] এখানে কি তুমি নিজের সাথে কোন অমিল খুঁজে পাও? তুমি তো আলেম হয়েছ খ্যাতি কুড়ানোর জন্য। নিজ সৎআমল প্রকাশ করে এবং জ্ঞানের গভীরতা প্রদর্শন করে তুমি তৃপ্তি পেতে চাও।

তুমি মানুষের কাছে স্বীকৃতি লাভের প্রশান্তিতে তুষ্ট। তোমার নেক আমলগুলো তুমি স্রষ্টাকে জানিয়ে পরিতৃপ্ত হও না বরং মানুষের প্রশংসা পেলেই খুশী হও। তুমি কামনা কর, মানুষ তোমার প্রশংসা করুক। তোমাকে অবলোকনের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ করুক। তোমার সেবা করুক, সম্মান করুক এবং বিভিন্ন সভা-সম্মেলনে তোমাকে সামনে এগিয়ে দিক। এতেই তুমি প্রবৃত্তির সবচেয়ে বড় স্বাদ আস্বাদন কর। আর এ কাজগুলো করে তুমি মনে কর যে, তোমার জীবন আল্লাহ্র পথে নিবেদিত এবং তাঁরই ইবাদতে রত। অথচ তুমি এসব গোপন প্রবৃত্তির মাঝে আসক্ত। জেনে রাখ, আল্লাহ্র নিকটে তোমার নাম মুনাফিকদের তালিকাভুক্ত...। আমি কথাগুলো শুধু চুপচাপ শুনে যাই। এই কথাগুলোর কোন প্রতিউত্তর আমার কাছে নেই। কারণ তার কথাগুলো শতভাগ সত্য।

সত্যিই আমি ইবাদতের মাঝে স্বাদ পাই না। কারণ আমি জানি, আমার ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নয়। লোক দেখানো ইবাদত করার পরে যখনই মনে হয়, আল্লাহ তো অন্তর দেখেন। তখন অন্তরে ইবাদতের প্রশান্তিগুলো

**. শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।*
১. জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম ১/৭১।
২. মুসলিম হা/১৯০৫।
৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১১/৪৮৫।
৪. যাহাবী, কিতাবুল কাবায়ের পৃঃ ১৪৫।

কেমন যেন শুকিয়ে যায়। আমার নফস আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, আরে! তুমি তো অমুক অমুক ইবাদত করছ। অনেকে তো সেটাও করে না। এটা ভেবে পরিতৃপ্ত হওয়ার চেষ্টা করি। আবার মনে হয়, কেউ যদি আমার কাছে একটি উপহার এনে বলে, 'এটা আমি তোমার জন্য নিয়ে আসিনি। অমুকের জন্য নিয়ে এসেছিলাম। তবে তিনি এটা প্রত্যাখ্যান করেছেন। এখন এটা তুমিই রাখ'। তবে কি আমি সেই উপহার রাখতে পারব? কখনোই না। কারণ এটা আমার আত্মমর্যাদায় আঘাত করবে। আমার মনে হবে, সে তো আমার জন্য নিয়ে আসেনি, আমি কেন নিব? অথচ আমি মানুষকে দেখানোর জন্য দান করি, ছালাত আদায় করি। আর নফস আমাকে ধোঁকা দিয়ে বলে, আল্লাহ এগুলো কবূল করছেন। তিনি খুব সন্তুষ্ট হচ্ছেন।

মাঝে মাঝে অন্তরটা পরিবর্তন হয়। ভাবি, মানুষের কাছে খ্যাতি অর্জনের জন্য এত লৌকিকতা, এতটা কষ্ট বরণ করা। অথচ এই দুনিয়ার সকল মানুষের কাছে ভাল হওয়ার পরে, সফলতা অর্জনের পরে এই জীবনের কি পরিবর্তন হবে? এটা তো আগের মতই থাকবে। এটা কি চিরস্থায়ী হবে? এটা কি পূর্ণ হয়ে যাবে, যেভাবে একটা গ্লাস পানি দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়? হবে না। কিছু চাওয়া তো অপূর্ণ থেকেই যাবে। কিছু মানুষের কাছে তো আমি খারাপ থেকেই যাব। তবে এত মেহনত কিসের! এত লৌকিকতা কিসের! সবকিছুর মূলে কি কেবল একটি ভাল দিনের আশা? ভাল দিনের আশায় তো জীবন পার হয়ে গেল। এখন এসে বোঝা গেল, জীবনে আমরা ক্রমশ খারাপ দিনের দিকে এগিয়ে যাই। জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে এই জীবনে আর ভাল দিন আসা সম্ভব নয়।

সেই ছোট বেলায় পড়েছিলাম, থাকব না কো বদ্ধ ঘরে, দেখব এবার জগণ্টাকে...। জগৎ দেখার সেই তীব্র আকাঙ্খা এখন আর নেই। কারণ এখানে পরতে পরতে লুকানো মিথ্যা, লৌকিকতা। সবাই এখানে সুন্দরটুকু প্রদর্শন করে, কুৎসিতটুকু ঢেকে রাখে। আমিও সেটাই করি। এই জগতের কি আর দেখব? আমার জীবনে যখন দুঃখ-কষ্ট নেমে আসে তখন এই জগৎই সবার আগে এসে বলে, সে আমার কষ্ট বুঝতে পারছে। সে আমার সাথে আছে। কিন্তু আমি অনেকগুলো পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পরে বুঝতে পারলাম, আল্লাহ ছাড়া কেউই আমার সাথে নেই। সবার মুখে মিথ্যা আশ্বাস। মিথ্যা প্রশংসা। মিথ্যা সহানুভূতি।

ধীরে ধীরে সবকিছু আমার কাছে বিষিয়ে উঠেছে। তেতো হয়ে গেছে। এখন আমি মনে করি, জীবনের প্রতিটি ঐ মুহূর্ত, যা আমাকে ছালাতে দাঁড়াতে বাধ্য করে, হাত তুলে কাঁদতে বাধ্য করে, প্রত্যেক ঐ কষ্ট যা আমাকে দুনিয়ার হাকীকত চেনায়, আল্লাহ্কে আরো আপন ভাবায় এগুলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার প্রতি বিশেষ নে'মত। যে নে'মত আল্লাহ শুধু তার খাছ বান্দাদের দান করে থাকেন। আমার দুর্ভাগ্য যে, এই নে'মতকে আমি আযাব হিসাবে গ্রহণ করি। আর দুনিয়ার জৌলুসে ডুবে প্রতিপালককে ভুলে যাওয়াকেই নে'মত মনে করি। জানি না, কিভাবে আমি আল্লাহর সৎ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হব।

এই লোক দেখানো আমল আমার ঈমানকেও দুর্বল করে ফেলেছে। আমার একজন রব আছেন। যিনি আমাকে সব সময় দেখছেন। এগুলো কথার ওপরে আমার বিশ্বাস খুবই শিথিল। আল্লাহ আমাকে সব সময় দেখছেন বলে যদি বিশ্বাস করতাম তবে আমি শুধু ইবাদতের মাঝেই আল্লাহ্কে খুঁজতাম না। গুনাহের মাঝেও মনে হ'ত, আল্লাহ আমাকে দেখছেন। আমি যখন মাযলুম হই শুধু তখনই আসমানের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ্র সাহায্যের আশা করতাম না, আমি যখন যালেম তখনও আসমানের দিকে তাকিয়ে আযাবের ভয় করতাম। আমি তো আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস নিজের সুবিধা অনুযায়ী করি। এজন্যই আমি মাযলুম হওয়ার পরে যখন আসমানের দিকে দু'হাত তুলে সাহায্য চাই তখন আর আমার প্রতি আল্লাহ্র সাহায্য আসে না। কেন আসে না সেটাও ভেবে দেখার সুযোগ আমার হয় না।

লোক দেখানো কিছু ছালাত ও ছাদাক্বাকে অনেক বেশী ভেবে আমি দিন-রাত গুনাহ করে যাই। আমার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাওয়া মাত্রই তিনি সবকিছু ক্ষমা করে দেবেন। মনে করি, তিনি তো আমাকে নিজ হাতে তৈরি করেছেন। কিভাবে আমাকে আগুনে পোড়াবেন? তার কি মায়া হবে না? ইত্যাদি আবেগময় কথা মনে ভাসে। সেই আবেগকে পুঁজি করে আমি সর্বশক্তি দিয়ে গুনাহ করি। কিন্তু আমার নফস বোঝে না যে, আল্লাহ আবেগের বশীভূত নন। তিনি এগুলো থেকে পবিত্র। এটা বোঝার জন্য অনেক দলীল প্রমাণের প্রয়োজন নেই। একটু খেয়াল করলেই এটা বোঝা যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, আমার কোন শত্রুর যদি তিনটা ছোট সন্তান থাকে। তবে আমি কখনোই চাইব না যে, আমার শত্রু এই ছোট্ট ছোট্ট সন্তান রেখে রোড এক্সিডেন্টে মারা যাক। কারণ এখানে আমার আবেগ কাজ করে। তার মৃত্যুর পরে তার পরিবারের অসহায়ত্ব ভাবতে গেলে কষ্ট হয়। এদিকে আল্লাহ তার বান্দাদের কত বেশী ভালবাসেন তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তারপরও কিন্তু তিনি প্রতিদিন এমন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু দেন যাদের ছাড়া তাদের পরিবার অসহায়। যাদের মৃত্যুর খবর শুনলেই অন্তরটা হাহাকার করে ওঠে। তাহ'লে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্র তেমন আবেগ নেই যা আমার আছে। আল্লাহ নিজ ইচ্ছা বাস্তবায়নে কঠোর। সুতরাং তার পাওনা আদায়ের বিষয় খুব সিরিয়াসভাবে নেয়া দরকার।

আমরা নিজেদের জীবন পরিচালনায় বে-পরোয়াদের ভয় করি। কখনো বাবার চেয়ে চাচা যদি বেশী কড়া মেজাযের হন, তখন বাবার চেয়ে চাচাকে বেশী ভয় করি। কর্মক্ষেত্রে যদি কোন উর্ধ্বতন দায়িত্বশীল এমন হন তবে তার বিষয়গুলো একটু ভিন্নভাবে গুরুত্বের সাথে নেয়ার চেষ্টা করি। তবে আল্লাহ্র বিষয়ে আমরা সু-ধারণায় ডুবে থাকি। এখানে শুধু আমি ক্ষমার ঘোষনাগুলোই দেখতে পাই। জাহান্নামের বর্ণনাগুলো দেখতে পাই না। তিনি যে অনন্তকাল জাহান্নামে শাস্তি দেবেন তা কখনো অন্তরে দাগ কাটে না। রাগের পরিমাণ কত বেশী হ'লে তা অনন্তকালেও শেষ হয় না, এগুলো কখনো চিন্তা করি না। তবে এগুলোও একটু ভেবে দেখা দরকার।

তিনি আমাকে জীবন-বিধান দিয়েছেন। আমি এই বিধান মান্য করি বা না করি, তিনি কখনো আমাকে রিমাইণ্ডার দেন না। তিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তবে এবিষয়ে আমার কোন মতামত নেননি। তিনি আমাকে ইচ্ছামত একটি দেশে, বর্ণে, ভাষায়, বংশে প্রেরণ করেছেন। এবিষয়েও তিনি আমার কোন মতামত নেননি। তিনি আমাকে হঠাৎ মৃত্যুদান করবেন। সেখানেও তিনি আমার কোন মতামত নিবেন না। আমার আমল যদি ভাল না হয় তবে তিনি আমাকে জাহান্নামে দিবেন। তখনও আমি বরাবরের মতই অপারগ থাকব। যদি তিনি আমাকে ক্ষমা করে চিরস্থায়ী জান্নাতে প্রবেশ করান তবুও এটা তারই ইচ্ছা। তার ইচ্ছার বাইরে কিছুই হবে না। তার কাজের বিষয়ে তিনি কাউকে জবাবদিহিতাও করবেন না। কারণ তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল। সুতরাং এমন একজন সত্ত্বাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঠিক কতটা সচেতন হওয়া দরকার হয়তো আমি বুঝতে পারছি না।

আমি তো মনে করি, আমার ইবাদত আল্লাহর প্রয়োজন। যেমন তেমন করে করলেই তিনি গ্রহণ করবেন। তবে বিষয় তো এমন নয়। তিনি তো অমুখাপেক্ষী। আমার ইবাদত তো আমারই মুক্তির জন্য। এটা বুঝতে আমার এত সমস্যা হচ্ছে কেন! শয়তানের তৈরি ধুম্রজাল আমাকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রেখেছে? মানুষকে খুশি করা তো দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজ। নুন তেকে চুনে গেলেই মানুষ পেছনের সব কথা ভুলে যায়। সেই কঠিন কাজেই শয়তান আমাকে আনন্দ দেয়! হায় আফসোস!

এভাবে আর নয়। মানুষকে খুশি করার জন্য আর একটি আমলও নয়। যদি একবার সুবহানাল্লাহ বলি, যদি এক পয়সাও ছাদাক্বা করি তবে সেটা হবে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য। মায়মূন বিন মেহরান (রহঃ) বলেন, ‘তোমাদের আমলের পরিমাণ এমনিতেই খুব কম। কাজেই এই কম আমলটুকুই বিশুদ্ধভাবে করার চেষ্টা কর’।[৫] আমি আর চাই না নিয়তের কারণে আমার নেকীগুলো নষ্ট হোক। আমি আমার অন্তরকে সেই বাক্যই শিক্ষা দিব যা আল্লাহ কুরআনে শিখিয়েছেন। নিশ্চয়ই আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু একমাত্র বিশ্বচরাচরের মালিক আল্লাহ্র জন্য।

---

৫. হিলয়াতুল আওলিয়া, ৪/৯২।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, ‘আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক ক্বিয়ামতের দিন দু’আঙ্গুলের ন্যায় পাশাপাশি থাকব’ *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায ‘আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী’, নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধীক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ’তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হৌন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউণ্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, **হিসাব নম্বর** ০১৫১২২০০০২৭৬১
আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন!

দারুল আবরার লাইব্রেরী

এখানে ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড’-এর পাঠ্যবই, ‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’ প্রকাশিত সকল বই এবং ‘তাফসীর পাবলিকেশন’-এর তাফসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবা : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক।*

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

কবিতা

ঈমান ভঙ্গের ১০ কারণ

-মুজাহিদুল ইসলাম স্বাধীন
হলিধানী, ঝিনাইদহ।

কি কি কাজে ওযূ ভাঙ্গে, ছিয়াম হয় নষ্ট,
এই বিষয়ে প্রায় সকলের ধারণা খুবই স্পষ্ট।
ছালাত নষ্ট হয় কি কাজে সবাই জানি প্রায়,
কিন্তু কি কি কাজে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়-
ক'জন জানি? বল দেখি নিজ বুকে হাত রেখে!
না জানলে, আজ জেনে নাও এই কবিতা থেকে।
কাউকে কভু করলে শরীক আল্লাহ্‌র ইবাদতে,
কোন ঈমান থাকবে না তার কুরআন-হাদীছ মতে।
আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে হবে সরাসরিভাবে;
আর মাধ্যম গ্রহণ করলে ঈমান চলে যাবে।
যারা কাফের প্রমাণিত কুরআন-হাদীছ দ্বারা,
তাদেরকেও কাফের বলে নেয় না মেনে যারা।
তারাও কাফের, কারণ তাদের ঈমান গেছে চলে
নয় বানানো; ইমাম সকল গেছেন এটা বলে।
নবী যেটা দেখিয়ে গেছেন তারচেয়ে ভালো পথ
থাকতে পারে- এমন হবে যাদের অভিমত;
অন্য কারও বিচার যারা নবীর চেয়ে ন্যায় ভাবে
থাকবে না আর মুমিন তারা, ঈমান চলে যাবে!
নবীর আনা বিধান নিয়ে হয় যদি সংশয়
অবিশ্বাসী সে, মুমিন কভু নয়।
সজ্ঞানে হোক অথবা হোক হাসি-খেলার ছলে,
নবীর নামে কেউ যদি কটু কথা বলে-
সাথে সাথেই সেই লোকটার ঈমান চলে যাবে,
কুরআন-হাদীছ খুঁজে দেখ অনেক প্রমাণ পাবে।
আল্লাহ তা'আলার বিধান নিয়েও ঠাট্টা করা হ'লে,
সে ব্যক্তির ঈমানটাও যাবে চলে!
যাদুর দ্বারা করলে কারও ভালো কিংবা ক্ষতি-
অথবা কেউ থাকলে খুশি এই বিদ্যার প্রতি,
চলে যাবে ঈমান, এতে সন্দেহ নেই কারও;
চাইলে কুরআন-হাদীছ থেকে দেখে নিতে পারো।
মুশরিকদের পক্ষে গিয়ে মুসলিমদের ক্ষতি
করবে যারা, দুঃসংবাদ আছে তাদের প্রতি।
বলছে কুরআন এমন লোকের ঈমান থাকে না কো,
তওবা করো এখনও কেউ এমন যদি থাকো!
যারা ভাবে, এই দুনিয়ায় এমনও কেউ হয়?
যারা নবীর আনা বিধান মানতে বাধ্য নয়;
তাদেরও ঈমান নেই;
এই কথাটা আমার তো নয় আছে কুরআনেই।
আর যদি কেউ ধর্ম থেকে নিজকে বিমুখ রাখে,
ইসলামী জ্ঞান অর্জনে তার আগ্রহ না থাকে,
জ্ঞান যা আছে সেই মোতাবেক আমলও না করে,
তিল পরিমাণ ঈমানও আর থাকবে না অন্তরে।
ঈমান পুরো নষ্ট হওয়ার দশটা কারণ এ-ই
যাচাই করো নিজের ঈমান আছে না-কি নেই!

বাদশাহী

-সারওয়ার মিছবাহ, রাজশাহী।

যাদের কলম যিন্দা রে ভাই, যাদের কলম দুর্নিবার,
তাদের কলম করবে আলোক এই দুনিয়ার অন্ধকার।
যাদের দেহ শিকল-জড়া, বক্ষে তবু মুক্ত প্রাণ,
তাদের কলম জ্বালবে মশাল, গাইবে নতুন জয়ের গান।
ঘুমন্তরা থাক ঘুমিয়ে, মুর্দারা থাক গোরস্থান,
যিন্দারা ধর কাস্তে-কোদাল, তৈরি কর গুলিস্তান।
জমাট রক্ত জমাট থাকুক, উষ্ণ রক্তে লাগুক দোল,
বাজুক দামামা দ্রিম দ্রিম দ্রিম, ছন্দে উঠুক গভীর রোল।
মোদের যুদ্ধে নেই বর্শা, ঢাল-তলোয়ার, রক্ত-খুন,
নীরব-বিজলী বর্ষে কলম, শ্বেতের বুকে কালো আগুন।
আমরা লেখক, হাঁকি কলম, ঘটে শব্দ-বিস্ফোরণ,
যালেম বাঁচে, বাঁচে না তার অন্যায় আর দুঃশাসন।
মোদের কলম এমনি ভাই, অস্ত্রের চেয়ে ভয়ংকর,
কলম দিয়েই দূর করি ভাই যত মন্দ-অসুন্দর।
এটাই মোদের পরম পাওয়া, এটাই মোদের বাদশাহী,
কণ্ঠে মোদের বিনয় ঝরে, হস্তে ফোঁসে বিদ্রোহী।

মুক্ত কর

-মিছবাহুল হক
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

আয়রে ছুটে নবীন-তরুণ নতুন জগৎ দেখতে হবে,
স্বাধীন হওয়ার গীত-গায়কের জীবন কেন বন্দী রবে?
কেন মোরা আনবো না-কো জ্ঞানকে মোদের বক্ষে ডেকে?
কেন মোরা জানব না-কো আকাশ সমান অজানাকে?
কণ্ঠে একটু আওয়াজ তুলে
বল না খানেক উচ্চৈঃস্বরে,
একঘেঁয়েমি জীবন কেন
এই বয়সে মোদের তরে?
যখন মোদের বিশ্বটাকে জানার ইচ্ছা অনন্ত,
হোক না মোদের ছুটতে দেয়া দিক হ'তে দিক-দিগন্ত।
সাগর বুকে ভাসতে দিতে থাকে যদি বক্ষে ভয়,
অজানা সব দ্বীপান্তরে কেমনে লোকারণ্য হয়!
উড়তে যদি না দাও মোদের
বান্ধা থাকে অধীর ভুজ,
কে উড়াবে চাঁদের দেশে
বাংলাদেশের লাল সবুজ?
ভাবনা অনেক কিশোর প্রাণে চিত্তে অনেক চিত্র আঁকি,
বিশ্ব বিজয় হয়নি আজো, অনেক বিজয় করতে বাকী।
অনেক বিজয় আনব মোরা দানে দানে ভরিয়ে দেব,
দাও না মোদের বাঁধন খুলে আমরা অনেক বড় হব।

স্বদেশ

সুন্দরবনের লোনাপানির নীচে সুপেয় পানির সন্ধান লাভ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে লোনাপানি, আর্সেনিক দূষণ এবং সুপেয় পানির সংকট মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। এই চরম বাস্তবতার মাঝেই আন্তর্জাতিক একদল গবেষক শুনিয়েছেন আশাজাগানিয়া সংবাদ। তাঁদের দাবী, এই অঞ্চলের মাটির গভীর স্তরে লুকিয়ে আছে দু'টি বিশাল মিঠাপানির আধার। যা হাযার বছর ধরে প্রায় অক্ষত অবস্থায় টিকে আছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ মেক্সিকো ইনস্টিটিউট অব মাইনিং অ্যান্ড টেকনোলজি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের যৌথ গবেষণায় গত ২৮শে অক্টোবর শুক্রবার বিখ্যাত বিজ্ঞান সাময়িকী 'নেচার কমিউনিকেশনসয়ে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকরা খুলনা শহর থেকে সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমানা পর্যন্ত ১২০ কিলোমিটার এলাকায় আধুনিক ভূ-তড়িৎ-চৌম্বকীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূগর্ভের গঠন পরীক্ষা করেন।

গবেষকদের বিশ্লেষণে দু'টি প্রধান উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে। একটি খুলনার উত্তরাংশে। এখানে প্রায় ২০০ থেকে ৮০০ মিটার গভীরে ৪০ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি বিশাল মিঠাপানির স্তর রয়েছে। যা সরাসরি সুপেয় পানি হিসাবে ব্যবহার করা যাবে। দ্বিতীয়টি সুন্দরবনের অভ্যন্তরে, যা আকারে ছোট ও গভীরতা কম। সুন্দরবন বিষয়ক গবেষক ইসমে আযম এই আবিষ্কারকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন।

[আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। আল্লাহ বলেন, তোমরা কি দেখ না, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে সবকিছুকে আল্লাহ তোমাদের বশীভূত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও গোপন নে'মত সমূহ পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন? অথচ লোকদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা কোনরূপ জ্ঞান, পথনির্দেশ বা উজ্জ্বল কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে' (লোকমান ৩১/২০)।]

বাংলাদেশ ব্যাংকে ভারতীয় সফটওয়্যার যুগের অবসান : ফিরল সাইবার সার্বভৌমত্ব

দীর্ঘ ১৪ বছরের পরাধীনতার গ্লানি মুছে অবশেষে নিজস্ব কোর ব্যাংকিং সিস্টেম-এ ফিরছে বাংলাদেশ ব্যাংক। আগামী ১৮ই ডিসেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হতে যাচ্ছে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান টাটা কনসালট্যান্সি সার্ভিসেসের (টিসিএস) সফটওয়্যার। এর মাধ্যমে দেশের আর্থিক খাতের 'সাইবার সার্বভৌমত্ব' পুনরুদ্ধারের পথ সুগম হ'ল। ২০১১ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনের ৩০ তলায় ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের স্থায়ী অফিস ছিল। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সার্ভার অপারেশন, ডাটাবেজ অ্যাডমিন পোর্ট, এনক্রিপটেড ফাইল সিস্টেম এবং সিস্টেম পাসওয়ার্ড লেভেল কনফিগারেশনে তাদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল। সংবেদনশীল আর্থিক তথ্যের ওপর এই বিদেশী নিয়ন্ত্রণ ছিল দেশের নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি।

অভিযোগ রয়েছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আভ্যন্তরীণ একটি প্রভাবশালী সিন্ডিকেট ও নীতিনির্ধারকদের অনিচ্ছার কারণে দীর্ঘ ১৪ বছর নিজস্ব সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ আটকে ছিল। এই দীর্ঘ সময়ে লাইসেন্স নবায়ন, পরামর্শক ফি ও সার্ভিস চার্জের নামে প্রায় এক হাযার কোটি টাকা টিসিএস-এর মাধ্যমে বিদেশে চলে গেছে। ২০১৬ সালের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় এই বিদেশী সফটওয়্যারের নিরাপত্তা দুর্বলতা ধরা পড়লেও রহস্যজনক কারণে তখন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি-১ বিভাগের তরুণ প্রযুক্তিবিদদের দীর্ঘ প্রচেষ্টায় তৈরি হয়েছে নিজস্ব কোর ব্যাংকিং সফটওয়্যার 'বিসিবিআইসিএস'। গত ৮ই ডিসেম্বর এর চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়। নতুন এই ব্যবস্থা চালুর ফলে ডাটা সার্বভৌমত্ব রক্ষা পাবে। রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্য আর বিদেশী প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকবে না। রক্ষণাবেক্ষণ ও লাইসেন্স বাবদ বছরে শত কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। ব্যাকডোর বা সাবোটাজের ঝুঁকি কমবে এবং দ্রুত সিস্টেম কাস্টমাইজ করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের মতে, ১৮ ডিসেম্বর কেবল একটি সফটওয়্যার পরিবর্তন নয়, বরং এটি দেশের আর্থিক খাতের প্রযুক্তিগত 'স্বাধীনতা দিবস'। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছে, 'আমরা আর কাউকে আমাদের ডাটা ভল্টের চাবি দেব না'।

[ধন্যবাদ তরুণ প্রযুক্তিবিদদের। সত্যিকার অর্থেই দেশপ্রেমের অনন্য নিদর্শন এটি। আল্লাহ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করুন (স.স.)]

বিদেশ

সুদানে প্রায় ২ কোটি মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটে এবং ৬০ লাখ অনাহারে দিন কাটাচ্ছে

যুদ্ধবিধ্বস্ত সুদানে মানবিক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। সংঘাতের কারণে দেশটিতে প্রায় ২ কোটি মানুষ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। যার মধ্যে ৬০ লাখ মানুষ দিন কাটাচ্ছে অনাহারে। গত ৮ই ডিসেম্বর বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানিয়েছে।

এক সাক্ষাৎকারে সংস্থাটির উপ-নির্বাহী পরিচালক কার্ল স্কাউ পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরে জানান, ডব্লিউএফপি আকাশপথে খাবার ফেলা, ডিজিটাল অর্থ স্থানান্তর ও মোটরসাইকেলসহ বিভিন্ন উপায়ে দেশজুড়ে ৫০ লাখ মানুষকে সহায়তা দিচ্ছে। বিশাল চাহিদার তুলনায় যা অত্যন্ত অপ্রতুল। বিশেষ করে উত্তর দারফুরের আল-ফাশির ও পশ্চিম কার্দোফানের বাবনুসার মতো সংঘাতপূর্ণ এলাকাগুলোতে ত্রাণ পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গত অক্টোবরে আল-ফাশির আরএসএফের দখলে গেলেও বাবনুসার দখল নিয়ে সরকারী সেনাবাহিনী ও আরএসএফের মধ্যে পরস্পরবিরোধী দাবী ও লড়াই অব্যাহত থাকায় দুর্গম এলাকার বাসিন্দারা চরম বিপাকে পড়েছেন।

[আমরা যুদ্ধের অবসান চাই। আল্লাহ তুমি নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুমতি দাও (স.স.)]

মুসলিম জাহান

পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম হাফেয সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আছিম মুনীর

পাকিস্তানে বর্তমান ক্ষমতার নিরঙ্কুশ কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছেন দেশটির ইতিহাসের প্রথম হাফেয সেনাপ্রধান ও দ্বিতীয় ফিল্ড মার্শাল আছিম মুনীর। যিনি সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে কার্যত আইনের ঊর্ধ্বে থেকে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছেন। বর্তমানে ফিল্ড মার্শাল আছিম মুনীরের হাতে এখন পাকিস্তানের সামরিক, কৌশলগত ও সংবিধানগত প্রভাবের সব চাবিকাঠি।

বর্তমানে তিনি একদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের

প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং অন্যদিকে ভারতের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছেন। অপরদিকে আমেরিকা ও চীন উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষা করে পাকিস্তানের কৌশলগত অবস্থান ধরে রাখা জেনারেল মুনীরকে বর্তমান সময়ের অন্যতম আলোচিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

১৯৬৮ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে সম্ভ্রান্ত এক মুসলিম পরিবারে আছিম মুনীরের জন্ম। সৈয়দ বংশের এই পরিবারে ইসলামী মূল্যবোধ ছিল গভীরভাবে প্রোথিত। পিতা হাফেয সৈয়দ সরওয়ার মুনীর ছিলেন রাওয়ালপিণ্ডির এফজি হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল ও একজন ইমাম। সেকারণ তিনি ধর্মীয় আবহে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নৈতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন রাওয়ালপিণ্ডির মারকায মাদ্রাসা দারুত তাওহীদে। পরবর্তী সময়ে তিনি অ্যাবোটাবাদের পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমী থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা শেষে তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। অতঃপর 'অফিসার্স ট্রেনিং স্কুল'-এর ১৭তম কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেন এবং অসাধারণ মেধা ও নেতৃত্বের গুণাবলী প্রদর্শনের জন্য তিনি ক্যাডেট হিসাবে সর্বোচ্চ সম্মাননা 'সোর্ড অব অনার' লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি ২৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করেন। অতঃপর তিনি লেফটেন্যান্ট কর্ণেল হিসাবে সঊদী আরবে প্রেষণে কর্মরত ছিলেন। এই সময়ে ৩৮ বছর বয়সে তিনি পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। আছিম মুনীর ২০১৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর 'মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স'-এর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পান। ২০১৮ সালে তিনি পাকিস্তানের শক্তিশালী গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই'-এর মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। তিনিই পাকিস্তানের ইতিহাসে একমাত্র সেনাপ্রধান, যিনি 'এমআই' এবং 'আইএসআই' উভয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন। সর্বশেষ সংবিধানের ২৭তম সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি বর্তমানে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হন। এর মাধ্যমে তিনি এখন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান এবং সাংবিধানিকভাবে একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী।

[সর্বোচ্চ ক্ষমতা লাভের পর পদস্খলনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ যেন তাকে রক্ষা করেন (স.স.)]

মায়ের সেবার অধিকার নিয়ে আদালতে দুই ভাইয়ের লড়াই

বর্তমানে যেখানে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ মানেই জমিজমা বা অর্থ-সম্পদ দখলের লড়াই, সেখানে সঊদী আরবের আল-কাছীমের আল-আসিয়াহ শহরে ঘটে গেছে এক নযীরবিহীন হৃদয়স্পর্শী ঘটনা। পঁচাত্তর বছর বয়সী এক বৃদ্ধ এবং তাঁর ছোট ভাই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কোন সম্পদ ভাগাভাগি করতে নয়, বরং নিজেদের বৃদ্ধা মায়ের সেবার দায়িত্ব কার কাঁধে থাকবে, তা নিশ্চিত করতে।

ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন হিজাম আল-গামেদী নামের এক ব্যক্তি। কয়েক বছর ধরে তিনি তাঁর অতিবৃদ্ধা মায়ের সেবা-যত্ন একাই করে আসছিলেন। একদিন তার ছোট ভাই দাবী করলেন, এখন থেকে মায়ের দেখাশোনা এবং খেদমতের দায়িত্ব তিনি পালন করতে চান। কিন্তু হিজাম কিছুতেই রাযী হননি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি মায়ের খেদমত করে যেতে চান। দুই ভাইয়ের এই পবিত্র প্রতিযোগিতায় কেউ কাউকে ছাড় দিতে না চাইলে বিষয়টি শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। আদালতে বিচারক মাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি আপনার কোন ছেলের কাছে থাকতে চান?' বৃদ্ধা মা তখন আবেগজড়িত কণ্ঠে উত্তর দেন, 'এরা দু'জন আমার দুই চোখের মতো। একটিকে রেখে আমি অন্যটিকে কিভাবে বেছে নেব? আমি কাউকেই ছাড়তে পারব না'। মায়ের এই উত্তরে আদালত কক্ষে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিচারক সব দিক বিবেচনা করে দেখলেন যে, বড় ভাই হিজাম নিজেও বেশ বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এবং অসুস্থ। তাই মায়ের সঠিক যত্নের কথা চিন্তা করে আদালত ছোট ভাইয়ের পক্ষে রায় দেন এবং মায়ের যিম্মাদারী ছোট ভাইকে প্রদান করেন। রায় শোনামাত্রই ৭৫ বছর বয়সী হিজাম বিচারকের সামনেই অঝোরে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাঁর এই কান্না কোন মামলা হারার জন্য ছিল না, ছিল না কোন সম্পত্তি হারানোর বেদনা। তাঁর এই কান্না ছিল মায়ের সেবা করার মতো মহান সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার কষ্টে।

এই ঘটনাটি সঊদী আরবসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ত্যাগের ও মাতা-পিতার প্রতি ভালোবাসা ও খেদমতের এক অনন্য নযীর সৃষ্টি করে। আধুনিক সমাজে যেখানে বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যা বাড়ছে, সেখানে এই দুই ভাইয়ের লড়াই সারা বিশ্বের সন্তানদের জন্য এক অনন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

পাকিস্তানে ৬৩৬ বিলিয়ন ডলারের স্বর্ণভাণ্ডার আবিষ্কার

পাকিস্তানে খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের হরিপুর যেলার তারবেলায় মিলেছে বিশাল স্বর্ণের মওজুদ। গত ৪ঠা নভেম্বর মঙ্গলবার পাকিস্তানের এয়ার করাচীর চেয়ারম্যান ও ফেডারেশন অব পাকিস্তান চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফপিসিসিআই) সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি হানিফ গওহর জানান, তারবেলায় আবিষ্কৃত এ সোনার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৬৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তিনি বলেন, স্বর্ণের এ মওজুদ পাকিস্তানের অর্থনীতির জন্য এক গেমচেঞ্জার হ'তে পারে। এ সম্পদ দিয়ে দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করাও সম্ভব। তিনি আরো জানান, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খনন কোম্পানি–অস্ট্রেলিয়া ও কানাডার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা চলছে। পাকিস্তান সরকারের অনুমোদন পাওয়া মাত্রই স্বর্ণ উত্তোলনের কাজ শুরু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন গওহর। রেকর্ড পরিমাণ বৈদেশিক ঋণ, মুদ্রাস্ফীতি ও ডলারের সংকটে জর্জরিত দেশটির জন্য এটি আল্লাহ্র এক 'অপ্রত্যাশিত অনুদান' হ'তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

চোখে মাইক্রো চিপ বসিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছেন দৃষ্টিহীনেরা

লন্ডনের মুরফিল্ডস আই হসপিটালে পরিচালিত এক আন্তর্জাতিক ট্রায়ালে দৃষ্টিহীন রোগীদের চোখে সফলভাবে একটি মাইক্রো চিপ প্রতিস্থাপন করে তাদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। 'প্রিমা ইমপ্লান্ট' নামক ২ মিলিমিটারের এই চিপটি 'জিওগ্রাফিক অ্যাট্রোফি' (মাকুলার ডিজেনারেশনের জটিল পর্যায়) রোগীদের রেটিনার নীচে স্থাপন করা হয়। রোগীরা একটি বিশেষ ক্যামেরা-যুক্ত চশমা পরেন, যা ভিডিও চিত্রকে ইনফ্রারেড সিগন্যাল হিসাবে ইমপ্লান্টে পাঠায়। ইমপ্লান্টটি সেই সিগন্যাল অপটিক নার্ভের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠালে রোগী দেখতে পান। নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন-এ প্রকাশিত এই গবেষণা অনুযায়ী, ট্রায়ালে অংশ নেওয়া ৩২ জন রোগীর মধ্যে ২৭ জনই পড়ার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন। ৭০ বছর বয়সী এক রোগী এই প্রযুক্তির সাহায্যে পুনরায় বই পড়তে পারছেন। চিকিৎসকরা আশা করছেন, এই প্রযুক্তি আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই সহজলভ্য হ'তে পারে। তবে এটি কেবল সচল অপটিক নার্ভ সম্পন্ন রোগীদের ক্ষেত্রেই কার্যকর হবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা সম্মেলন : মেহেরপুর

২১শে নভেম্বর শুক্রবার, মেহেরপুর : অদ্য বাদ আছর যেলা শহরের ড. শামসুযযোহা পার্কে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর উপদেষ্টা মাওলানা হায়দার আলী ও সহ-সভাপতি ইয়াকূব আলী। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তারীকুযযামান, গাংনী উপযেলার সভাপতি আবুল বাশার আব্দুল্লাহ ও মুজীবনগর উপযেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ।

যেলা সম্মেলন : গাইবান্ধা

২২শে নভেম্বর শনিবার, শিমুলবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা : অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা থানাধীন শিমুলবাড়ী আল-মা'হাদ ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমূদ, প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, বগুড়া যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আল-আমীন, সঊদী আরব শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি ড. মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান, ঢাকা বায়তুল মা'মুর জামে মসজিদের খতীব মাওলানা মুহাম্মাদ শামসুর রহমান আযাদী ও আব্দুর রহমান মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্স বগুড়ার খতীব মুহাম্মাদ আবূ নো'মান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মশিউর রহমান। সম্মেলনের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও অত্র মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব মশিউর রহমান ও মাদ্রাসা পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব হেবাতুর রহমান।

যেলা সম্মেলন : নরসিংদী

২৪শে নভেম্বর সোমবার, পাঁচদোনা, মাধবদী, নরসিংদী : অদ্য বাদ আছর যেলার মাধবদী উপযেলাধীন পাঁচদোনা স্যার কে.জি গুপ্ত স্কুল এ্যান্ড কলেজ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নরসিংদী যেলার উদ্যোগে যেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী মুহাম্মাদ আমীনুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, আহলেহাদীছ ইমাম ও ওলামা পরিষদের সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা), যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জাহাঙ্গীর হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি দেলাওয়ার হোসাইন ও অর্থ সম্পাদক হেমায়েত হোসাইন।

যেলা সম্মেলন : সাতক্ষীরা

আল্লাহ্র নিকটে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হ'ল ইসলাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

৯ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার, সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় ময়দান, সাতক্ষীরা : অদ্য বিকাল ৩-টা হ'তে যেলার সদর থানাধীন সাতক্ষীরা সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভার্চুয়াল ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি সূরা আলে ইমরানের ১৯ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, পৃথিবীতে অনেক ধর্ম প্রচলিত থাকলেও মহান আল্লাহ্র নিকটে একমাত্র মনোনীত দ্বীন হ'ল ইসলাম। ইহূদী-নাছারারা আল্লাহ কর্তৃক এই মনোনীত ধর্মের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছে। এমনকি তাদেরকে দেওয়া ধর্মের বিধি-বিধান ও তারা নিজেদের খেয়াল-খুশিমত রদবদল করেছে। ফলে তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। অথচ দূর্ভাগ্য যে, আজকের পৃথিবীতে ইহূদী-নাছারাদের প্রদত্ত রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির জয়জয়কার চলছে। মুসলমানরা অকপটে এগুলো গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই আমাদেরকে যাবতীয় বিকৃত নীতি বাদ দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন-ব্যবস্থা ইসলামের নীতি আদর্শ গ্রহণ করতে হবে এবং সার্বিক জীবনে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। তবেই সঠিক পথ পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি মাসঊদ রেযা খান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক।

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও সঊদী আরব সফর

১২-১৪ই অক্টোবর, সিঙ্গাপুর : গত ১২ই অক্টোবর রবিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মশীউর রহমান এক তাবলীগী সফরে সিঙ্গাপুর গমন করেন। সিঙ্গাপুর শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হালীমের নেতৃত্বে দায়িত্বশীলগণ তাদেরকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর দুই দিনব্যাপী বিভিন্ন দাওয়াতী প্রোগ্রামে তারা ব্যস্ত সময় কাটান। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সিঙ্গাপুরে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দায়িত্বশীলবৃন্দ সক্রিয়ভাবে দাওয়াতী কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। কিছুটা প্রতিকূল পরিবেশেও তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বহু বাংলাভাষী প্রবাসীর কাছে হকের দাওয়াত পৌঁছে যাচ্ছে। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

১২-১৬ই অক্টোবর, মালয়েশিয়া : গত ১১ই অক্টোবর শনিবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এবং ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ অলি হাসান দাওয়াতী সফরে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে গমন করেন। কুয়ালালামপুর বিমানবন্দরে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানান মালয়েশিয়া শাখা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক আবূ ইউসুফ এবং মাহিদুল ইসলাম। ১ম দিন ১২ই অক্টোবর বাদ মাগরিব তারা বন্দর বারু আমপাং-এ আরএইচবি ইসলামী ব্যাংকের ৩য় তলায় অবস্থিত সুরাওয়ে এবং একই দিন বাদ এশা তাসিক তামবাহান আমপাং-এ জনাব সাইফুল ইসলামের ওয়ার্কশপে অনুষ্ঠিত দাওয়াতী প্রোগ্রামে যোগদান করেন। এতে মালয়েশিয়ায় বাঙালী আহলেহাদীছদের মধ্যে দাওয়াতী কার্যক্রমে নেতৃত্বদানকারী সাঈদ আহমাদ, মাহিদুল ইসলাম, মাসঊদুর রহমান প্রমুখসহ কুয়ালালামপুরে অবস্থানরত প্রবাসী বাঙালীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৪ই অক্টোবর বাদ মাগরিব তারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া ক্যাম্পাসে অবস্থানরত বাঙালী ছাত্রদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এছাড়া ১৫ই অক্টোবর পাহাং প্রদেশের পেরাক যেলার লাদাং উলু বাছির পামওয়েল মিলে অবস্থিত শামসুল মা'আরিফ মসজিদে প্রবাসী বাঙালী ওয়ার্কারদের নিয়ে আরেকটি দাওয়াতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিঙ্গাপুর সফর থেকে এসে যোগদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ মশীউর রহমান সাগর। অনুষ্ঠান শেষে জনাব মুহাম্মাদ আলী (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)-কে আহ্বায়ক এবং আবু ইউসুফ (কুমিল্লা)-কে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট মালয়েশিয়া শাখা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশী আহলেহাদীছ বা সালাফীদের সংখ্যা যথেষ্ট রয়েছে। তবে সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করছেন। বর্তমানে কুয়ালালামপুর শহরে উল্লেখিত ২টি সুরাও-এর মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফালিল্লাহিল হাম্দ।

১৭-২০শে অক্টোবর মক্কা, মদীনা, তায়েফ ও আল-কাছীম : সফরকারী নেতৃবৃন্দ সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া সফর শেষে ১৭ অক্টোবর সঊদী আরব গমন করেন। সঊদী আরব পৌঁছে তারা প্রথমে পবিত্র ওমরাহ পালন করেন। অতঃপর ১৭-২০ অক্টোবর পর্যন্ত তারা তায়েফ ও মদীনায় বিভিন্ন দাওয়াতী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। এরপর ২১শে অক্টোবর আল-কাছীম শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং ২২শে অক্টোবর আল-খাবরার একটি ইস্তারাহায় বাদ মাগরিব এক ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করেন। আল-ক্বাছীম শাখার সভাপতি রাজিব বিন হাবীবের সভাপতিত্বে উক্ত সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার, কুয়েত প্রবাসী বিশিষ্ট দাঈ হাবীবুর রহমান, আল-কাছীম শাখার উপদেষ্টা আবূ মুহাম্মাদ সাদ্দাম ও সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

২৩শে অক্টোবর, রিয়াদ : ২৩শে অক্টোবর নেতৃবৃন্দ রাজধানী রিয়াদে গমন করেন এবং একইদিন বাদ মাগরিব দায়িত্বশীল ও কর্মী সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে শায়খ মুশফিকুর রহমান (রাজশাহী)-কে সভাপতি, হাফেয মুহাম্মাদ আখতার (নওগাঁ)-কে সহ-সভাপতি এবং আব্দুল হাই (রাজশাহী)-কে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। পরদিন ২৪শে অক্টোবর বাদ যোহর আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম আয়োজিত প্রাণবন্ত এক মতবিনিময় সভা ও সুধী সমাবেশে অংশগ্রহণের পর বাদ মাগরিব ছানাইয়া কাদীমার ইস্তিরাহাতুল ওয়াযিরিয়ায় আয়োজিত এক জনাকীর্ণ সম্মেলনে তারা যোগদান করেন। এতে রিয়াদের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগঠনের দায়িত্বশীল, কর্মী ও প্রবাসীরা অংশগ্রহণ করেন। এসময় সঊদী আরব শাখা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আখতার মাদানী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই মাদানী, উপদেষ্টা আব্দুল বারী ও আত-তাহরীক পাঠক ফোরামের দায়িত্বশীলবৃন্দসহ অন্যান্য দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২৫শে অক্টোবর, আল-খাফজী : ২৫শে অক্টোবর তারা রাজধানী রিয়াদ থেকে আল-খাফজীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং বাদ মাগরিব ছানাইয়া শাখা অফিসে আয়োজিত দায়িত্বশীল ও কর্মী বৈঠকে মিলিত হন। এসময় অন্যদের মধ্যে মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সঊদী আরব শাখা আন্দোলন-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হাই মাদানী, সাংগঠনিক সম্পাদক রিয়াযুল ইসলাম, রিয়াদ ছানাইয়া আছেমা শাখার দায়িত্বশীল আবুল হোসাইন এবং আত-তাহরীক পাঠক ফোরাম সঊদী আরব শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ তোফাযযল হককে ছানাইয়া শাখার সভাপতি এবং মুহাম্মাদ শামীম হোসাইনকে শিমালিয়া শাখার সভাপতি মনোনীত করে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

২৬শে অক্টোবর, দাম্মাম : ২৬শে অক্টোবর তারা আল-খাফজী থেকে দাম্মামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং সেখানে বাদ এশা দাম্মাম 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে এক দাওয়াতী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এতে দাম্মাম শাখার দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দসহ প্রবাসী বাঙালীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান শেষে আব্দুল্লাহ আল-মুন্নাকে সভাপতি এবং জামাল গাযীকে সাধারণ সম্পাদক করে দাম্মাম শাখা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। পরদিন ২৭শে অক্টোবর বাদ মাগরিব দাম্মাম ইসলামিক সেন্টারে মতীউর রহমান মাদানীর সভাপতিত্বে একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কথা থাকলেও বিশেষ কারণে তা স্থগিত হয়ে যায়। একই দিন দিবাগত রাত ১-টায় তারা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সফর শেষে দাম্মাম বিমানবন্দরে তাদেরকে বিদায় জানান বর্তমান কমিটির প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল্লাহ আল-মামূন, সহ-সভাপতি আবুল বাশার, সাধারণ সম্পাদক জামাল গাযী, অর্থ সম্পাদক আইয়ুব আলী প্রমুখ।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

(গত সংখ্যার পর)

৭২. কক্সবাজার ৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন বাজারঘাটা হাফেয আহমাদ চৌধুরী আহলেহাদীছ

জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি এ্যাডভোকেট শফীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সভায় এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ শফীউল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭৩. চাঁদপুর ৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন বাখরপুর কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভায় আতাউল্লাহ শরীফকে সভাপতি ও হেমায়েত হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭৪. রাঙ্গামাটি ৬ই ডিসেম্বর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন হোটেল গ্রীন হিলে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ফযলুল বারী মাস্টারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। সভায় ফযলুল বারী মাস্টারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আবূ হানীফকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

রাঙামাটির লংগদুতে দাওয়াতী সফর

৬ই ডিসেম্বর শনিবার : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'- এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব এক দাওয়াতী সফরে দেশের অন্যতম পার্বত্য যেলা রাঙামাটি গমন করেন। এসময় তাদের সফরসঙ্গী হন ঢাকা থেকে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরামে'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মশিউর রহমান, ঢাকা-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, বর্তমান কমিটির শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অলী হাসান ও চট্টগ্রাম থেকে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাফেয শেখ সা'দী। রাঙামাটি পৌঁছে তারা বেলা ১১-টায় স্পীডবোট যোগে দুর্গম এলাকা লংগদু উপযেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। দেড় ঘন্টা অবিরাম বোট চলার পর লংগদু থানার গুলশাখালী ইউনিয়নে পৌঁছেন। সেখানে নব প্রতিষ্ঠিত জামি'আ আস-সালাফিইয়াহ কমপ্লেক্স পরিদর্শন শেষে তারা নির্মাণাধীন কমপ্লেক্স মসজিদে যোহর ও আছর ছালাত জমা ও কৃছর আদায় করেন। ছালাত শেষে অপেক্ষমান স্থানীয় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, তাসলীম সরকার ও হাফেয শেখ সাদী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন রাঙামাটি যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ও স্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ শাহজাহান। অনুষ্ঠান শেষে স্থানীয় ব্যবসায়ী জনাব মুহাম্মাদ হানীফের বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ শেষে পুনরায় স্পীড বোট যোগে তারা রাঙামাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। ফেরার পথে তারা পার্শ্ববর্তী বগাচড় ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত বগাচড় জামে'আ আস-সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোশাররফ হোসাইনের আমন্ত্রণে উক্ত মাদ্রাসা পরিদর্শনের জন্য কিছু সময়ের যাত্রা বিরতি করেন। বোট থেকে নেমে কিছুপথ পায়ে হেঁটে তারা মাদ্রাসায় পৌঁছেন। মাদ্রাসা পরিদর্শন শেষে তারা পুনরায় রাঙামাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে মাগরিবের ছালাতের সময়ে রাঙামাটি পৌঁছেন। অতঃপর রাতেই ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নেতৃবৃন্দ পাহাড়ী জনপদে সালাফী দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠান দেখে অভিভূত হন। মহান আল্লাহ্র নিকটে এই দাওয়াত জনপদের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার এবং সাধারণ মানুষের হেদায়াতের দো'আ করেন।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ গত ১৮ই অক্টোবর হ'তে ১লা নভেম্বর পর্যন্ত শেরপুর যেলার ঝিনাইগাতী থানাধীন বাওইবাধা; ময়মনসিংহ যেলার ধোবাউড়া থানাধীন মেকিয়ারকান্দা; লক্ষীপুর যেলার রামগতি থানাধীন চরশিতা তহশিলদারপাড়া; মানিকগঞ্জ যেলার সদর থানাধীন নওখণ্ডা; কুষ্টিয়া যেলার কুমারখালী থানাধীন দড়িকোমরপুর, নন্দলালপুর ও দূর্গাপুর কাযীপাড়া; মিরপুর থানাধীন পোড়াদহ; দৌলতপুর থানাধীন ধর্মদহ ও দৌলতখালী পূর্ববাজারপাড়া এলাকায় তাবলীগী সফর করেন।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ

০৫ই ডিসেম্বর শুক্রবার দক্ষিণ বাখরপুর, চাঁদপুর : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন দক্ষিণ বাখরপুর কবিরাজ পাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ শরীফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মুছাদ্দিক প্রমুখ।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম (মৌসুমি)
- লিচু (মৌসুমি)
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল (এক্সট্রা ভার্জিন)
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com
SCAN ME

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১২১) : সম্প্রতি একজন বাউল মতবাদের অনুসারী প্রশ্ন তুলেছেন যে, আল্লাহ সর্বপ্রথম ইশক, নূর, আরশ, রূহ এই চারটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এছাড়াও একটি হাদীছে এসেছে, আল্লাহ প্রথম কলম এবং অন্য হাদীছে এসেছে আরশ সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-মীযান, দিনাজপুর।

উত্তর : চারটি বিষয়ের মধ্যে আরশ ব্যতীত বাকীগুলো ভিত্তিহীন। যদিও এর সমর্থনে কিছু জাল বর্ণনা রয়েছে যা মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যই শী'আরা বানিয়েছে *(ছহীহাহ হা/৪৫৮-এর আলোচনা; ইরাকী, তাখরীজু আহাদীছিল ইহইয়া পৃ. ৯৯; বাহারুল আনওয়ার ৫৪/১৭০-৭৫)*। মূলত সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলা পানি সৃষ্টি করেছেন। এরপর পানির উপর তার আরশ স্থাপন করেছেন। এরপর বস্তু জগতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন। আর এই কলমই আল্লাহ্র আদেশে পৃথিবীতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে তা লিখে দিয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাযার বছর আগে সকল মাখলূকের তাক্বদীর লিখে রেখেছেন। তিনি বলেন, 'তখন তাঁর আরশ পানির উপর ছিল' *(মুসলিম হা/২৬৫৩)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেছেন, 'এ হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ যখন তাক্বদীর নির্ধারণ করেছিলেন তখন তাঁর আরশ পানির উপর ছিল। অর্থাৎ তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করার সময় আরশ বিদ্যমান ছিল। তাক্বদীর লিপিবদ্ধ হওয়ার পর আরশ সৃষ্টি হয়নি' *(আছ-ছাফদিয়াহ, ২/৮২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ছিলেন, আর তাঁর আগে কিছুই ছিল না। আর তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। এরপর তিনি আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করলেন এবং যিকর (লাওহে মাহফূয)-এ সবকিছু লিখে দিলেন' *(বুখারী হা/৭৪১৮; মিশকাত হা/৫৬৯৮)*।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেছেন, 'এটিও প্রমাণ করে যে, যিকর (লওহে মাহফূয)-এ লেখা তখনই হয়েছিল, যখন আরশ পানির উপর ছিল' *(আছ-ছাফদিয়াহ, ২/৮২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, লিখ। কলম বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি লিখব? তিনি বললেন, পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে সমস্ত কিছুর তাক্বদীর লিখে দাও' *(আবুদাউদ হা/৪৭০০; মিশকাত হা/৯৪, সনদ ছহীহ)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনাকে দেখলে আমার মন শান্ত হয়, হৃদয় প্রশান্ত হয়ে যায়। দয়া করে আমাকে সবকিছুর বিষয়ে জানান। তখন তিনি বললেন, 'সমস্ত সৃষ্টিই পানির মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়েছে' *(আহমাদ হা/৭৯১৯, সনদ ছহীহ)*। ইবনু হাজার (রহঃ) বলেন, 'সুতরাং কলমের প্রথম সৃষ্টি হওয়া এ কথাটি পানি ও আরশের তুলনায় অন্যান্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার অগ্রবর্তী হওয়াকে বোঝায়। অথবা এর অর্থ হ'তে পারে, যে লিপিবদ্ধকরণ কলমের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে, তার দিক থেকে কলমই প্রথম। অর্থাৎ কলম সৃষ্টি করা হ'লে তাকে সর্বপ্রথম বলা হয়েছিল—লিখ' *(ফাৎহুল বারী ৬/২৮৯)*।

প্রশ্ন (২/১২২) : রজব মাসের বিশেষ ছালাত-ছিয়ামসহ বিভিন্ন ইবাদতের গুরুত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এসব ইবাদত পালন করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ ফাহাদ, নাটোর।

উত্তর : রজব মাসের বিশেষ মর্যাদা বা বিশেষ কোন ইবাদত যেমন ছালাত-ছিয়াম ও যিকির-আযকারের ব্যাপারে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবই যঈফ ও জাল। যেমন 'যে ব্যক্তি রজব মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করবে, তার জন্য আল্লাহ এক মাসের ছিয়াম লিখে দিবেন'। হাদীছটি জাল *(আল-লা'আলিল মাছনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাউযূ'আহ ২/১১৪-১১৫ পৃ.)*। এছাড়া 'পাঁচ রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। রজব মাসের প্রথম রাত, মধ্য শা'বানে, জুম'আর রাত, ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর রাতের দো'আ' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(ইবনু 'আসাকির, আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২)*।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'ছালাতুর রাগায়েব' নামে ১২ রাক'আত ছালাত যা রজব মাসের প্রথম জুম'আর দিন মাগরিব থেকে এশার মধ্যে পড়া হয় এবং মধ্য শা'বানের রাতে যে ১০০ রাক'আত ছালাত পড়া হয়, তা নিকৃষ্ট বিদ'আত' *(আল-মাজমূ' ৪/৫৬)*। তিনি আরো বলেন, এই ছালাতের আবিষ্কারককে আল্লাহ ধ্বংস করুন। এটি অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতায় পূর্ণ একটি ঘৃণিত বিদ'আত *(নববী, শরহ মুসলিম ৮/২০)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'রজব মাসে ছিয়াম রাখা সংক্রান্ত সবগুলো বর্ণনা যঈফ; বরং মওযূ' বা জাল। বিদ্বানগণ এব্যাপারে একটি বর্ণনাকেও নির্ভরযোগ্য বলেননি' *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৫/২৯০)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, রজব মাসে ছিয়াম পালন ও নফল ছালাত আদায়ের ব্যাপারে যে কয়টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবই জাল *(আল-মানারুল মুনীফ ৯৬ পৃ.)*। অতএব রজব মাসের জন্য বিশেষ কোন ইবাদত নেই।

প্রশ্ন (৩/১২৩) : হাদীছে এসেছে যে, ১৫ই শা'বানের পর ছিয়াম রাখা যাবে না। আবার এসেছে রাসূল (ছা.) এ মাসের পুরোটাই প্রায় ছিয়াম রাখতেন। এর ব্যাখ্যা কি?

-আল-আমীন, যশোর।

উত্তর : হাদীছে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার অর্থ হ'ল যারা শা'বান মাসের শুরু থেকে ছিয়াম রাখেন, তারা যেন ১৫ই শা'বানের পর আর না রাখেন। কেননা এতে শারিরীক দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। তবে সামর্থ্যবান হ'লে ১৫ই শা'বানের পরও ছিয়াম পালন করা যাবে। এছাড়া যারা সাপ্তাহিক ছিয়াম পালন করেন তারা করতে পারেন *(বুখারী হা/১৯৭০; মুসলিম হা/১১৫৬;*

নববী, আল-মাজমূ‘ ৬/৩৯৯-৪০০; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৪/১২৯)।

প্রশ্ন (৪/১২৪) : আবু লাহাবের পুত্র ও রাসূল (ছাঃ)-এর সাবেক জামাতা উৎবা বিন আবু লাহাবের বিরুদ্ধে তিনি কেন বদ দো‘আ করেছিলেন?

-মীযানুর রহমান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : উৎবা বিন আবু লাহাব ছিল রাসূল (ছাঃ) অন্যতম জামাতা। সূরা লাহাব নাযিল হ’লে আবু লাহাব তার দুই ছেলেকে নির্দেশ দেয় যেন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর দুই মেয়েকে তালাক দেয়। সেমতে একদিন আবু লাহাবের পুত্র উৎবা এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমি সূরা নাজমের ১ ও ৮ আয়াত দু’টিকে অস্বীকার করি, বলেই সে হেঁচকা টানে রাসূল (ছাঃ)-এর গায়ের জামা ছিঁড়ে ফেলল এবং তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। সে তার পিতার কথা মত রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা উম্মে কুলছূমকে তালাক দেয়। তার ভাই উৎবা একই ভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর অপর কন্যা রুক্বাইয়াকে তালাক দেয়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তখন তাকে বদ দো‘আ করে বললেন, ‘হে আল্লাহ! তুমি এর উপরে তোমার কোন একটি কুকুরকে বিজয়ী করে দাও’। এরপর উৎবা তার পিতার কাছে ফিরে এসে সব ঘটনা জানাল। পরে তারা একসাথে শামের দিকে সফরে বের হয়। পথিমধ্যে এক স্থানে তারা অবতরণ করলে নিকটবর্তী একটি গির্জা থেকে এক পাদ্রী তাদের দেখতে পেয়ে বলল, এ ভূমি হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল। তখন আবু লাহাব কুরায়েশদের বলল, তোমরা আমাদের সাহায্য কর! আমি আমার ছেলের ওপর মুহাম্মাদের বদদো‘আর ভয় করছি। তারা উটগুলো একত্র করে চারপাশে বসিয়ে রাখল এবং উৎবার চারপাশে বেষ্টনী তৈরি করল। কিন্তু তখন একটি সিংহ এসে উটগুলোর ফাঁকে গিয়ে তাদের মুখের গন্ধ শুঁকতে লাগল, অবশেষে উৎবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে হত্যা করল *(হাকেম হা/৩৯৮৪; বিস্তারিত দ্র. হাফাবা প্রকাশিত ‘সীরাতুর রাসূল (ছাঃ)’ সংশ্লিষ্ট অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৫/১২৫) : শবেবরাত সহ বিভিন্ন বিদ‘আতী অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রতিবেশীর প্রদত্ত খাবার খাওয়া যাবে কি? খাওয়া না গেলে কি করতে হবে?

-শামীম ইসলাম, ঝিনাইদহ।।

উত্তর : এধরনের বিদ‘আতী অনুষ্ঠানের জন্য তৈরীকৃত খাবার খাওয়া ও সেখানে উপস্থিত হওয়া সহ যেকোন প্রকার সহযোগিতা করা শরী‘আত সম্মত নয়। কারণ এটি উক্ত বিদ‘আতী কর্মে সহযোগিতার শামিল, যা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ৫/২)*। কোন কারণবশতঃ গ্রহণ করা হ’লে তা পশু-পাখিকে খাইয়ে দিবে।

প্রশ্ন (৬/১২৬) : জুম‘আর দিন ফজরের ছালাতে মুছল্লীদের অবস্থা বিবেচনায় সূরা সাজদাহ এবং দাহর অর্ধেক করে পাঠ করলে তা সুন্নাহ সম্মত হবে কি?

-মুহাম্মাদ সামী, গাযীপুর।

উত্তর : সুন্নাত হচ্ছে জুম‘আর দিনের ফজরের ছালাতে সূরা দাহর ও সূরা সাজদাহ পুরোটা পাঠ করা। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতে সূরা দু’টোর পুরো অংশ পাঠ করতেন *(মুসলিম হা/৮৭৯)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘সুন্নাত হ’ল দু’টিই সম্পূর্ণভাবে পড়া। কিন্তু সবসময় এ দু’টোই সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক নয়, যাতে অজ্ঞ কেউ মনে না করে যে এটি ফরয। বরং কখনো কখনো এ দু’টির বাইরে কুরআনের অন্যান্য অংশও পড়া উচিত’ *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ‘উল ফাতাওয়া ২৪/২০৬)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেছেন, নবী করীম (ছাঃ) জুম‘আর দিনের ফজরের দুই রাক‘আতে সম্পূর্ণ সূরা সাজদাহ এবং সূরা দাহর তেলাওয়াত করতেন’ *(যাদুল মা‘আদ ১/২০৩)*। তবে কেউ অংশবিশেষ পাঠ করে ছালাত আদায় করলে সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘অতএব তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ মনে হয়, তা-ই পড়ো’ *(মুয্যাম্মিল ৭৩/২০)*।

প্রশ্ন (৭/১২৭) : একজন মুসলিম কোন কারণে কাফের/ মুরতাদ হয়ে গেলে, পরবর্তীতে তিনি পুনরায় মুসলিম হ’তে চাইলে তার করণীয় কি? এক্ষেত্রে তিনি নিজে কালেমা পড়লেই হবে, নাকি কোন আলেমের কাছে গিয়ে কালেমা পড়তে হবে?

-মাসঊদ রানা, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : প্রথমত যদি কেউ ধর্মত্যাগ করার পর পাকড়াও না হয় বা আদালতে তোলা না হয় এবং সে নিজে নিজেই আল্লাহ্র কাছে আন্তরিকভাবে তওবা করে, তবে তার জন্য সত্যিকারের অনুশোচনাসহ কালেমা শাহাদাত পাঠই যথেষ্ট হবে। এজন্য তাকে কোন আলেমের কাছে বা আদালতে যেতে হবে না। **দ্বিতীয়ত** যদি সাক্ষ্য প্রমাণ বা নিজ স্বীকারোক্তির মাধ্যমে কোন ব্যক্তির ধর্মত্যাগ (রিদ্দাহ) প্রমাণিত হয় এবং সেটা আদালত পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। আর এরপর সে তওবা করার দাবী করে, তবে বিচারক চাইলে তাকে প্রকাশ্যে তওবা পাঠ করাবেন এবং এর ব্যাখ্যা তলব করবেন। সে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করলে এবং কালেমা পাঠ করে ফিরে আসলে সেটাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। আর ইসলামে ফিরে আসতে অস্বীকৃতি জানালে আদালত তার উপর হদ্দ জারি করবে’ *(আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিয়া ২২/১৯২)*।

প্রশ্ন (৮/১২৮) : আমি একটা এনজিওতে চাকুরী করি। এখানে কোন সূদের লেনদেন বা শরী‘আত বিরোধী কার্যক্রম নেই। কেবল সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করা হয়। কিন্তু আয়ের উৎস অমুসলিম বিদেশী দাতাদের সাহায্য। এই চাকুরী করা জায়েয হবে কি?

-মিরাজুল ইসলাম, চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তর : অমুসলিমদের অনুদানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান বা এনজিওতে চাকুরী করা জায়েয। তবে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেমন- (১) এনজিওটির কার্যক্রম যেন শরী‘আত বিরোধী না হয়। যেমন সূদী ঋণ, পরিবার-পরিকল্পনা ইত্যাদি। (২) যে কাজ করা হচ্ছে সে কাজটি যদি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ ও সমাজসেবামূলক হয়। (৩) হারাম পন্থায় আয় বা অবৈধ কাজের অংশীদার না হওয়া। উল্লেখ্য যে, অমুসলিমদের অনুদান গ্রহণে কোন বাধা নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম অমুসলিমদের হাদিয়া এবং অনুদান গ্রহণ করেছেন *(বুখারী ৯/৩৮৪, হা/২৫৭৩, ২৬১৫)*।

প্রশ্ন (৯/১২৯) : শরী‘আত-বিরোধী বিষয় (যেমন সূদভিত্তিক ব্যবস্থা) থাকা সত্ত্বেও অর্থনীতি ও হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে পড়ার

হুকুম কি?

-শরীফুল ইসলাম, রংপুর।

উত্তর : অর্থনীতি ও হিসাববিজ্ঞান অধ্যয়নের হুকুম মূলত শিক্ষার্থীর নিয়ত ও পড়ার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে। যদি অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হয় শরী'আতবিরোধী বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা, সমালোচনা করা এবং তার শারঈ বিকল্প উপস্থাপন করা অথবা কোন বৈধ চাকুরীর জন্য প্রয়োজনীয় সনদ অর্জন করা যেখানে উদ্দেশ্য হারাম কাজকে সমর্থন করা নয়, তাহ'লে এতে কোন দোষ নেই ইনশাআল্লাহ। যেমন বিসিএস ক্যাডার হওয়া, নিবন্ধন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক হওয়া বা যেকোন বৈধ চাকুরীতে যোগদান করা। কিন্তু যদি অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হয় হারাম কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নেওয়া, তাকে সমর্থন করা বা সূদভিত্তিক ব্যবস্থা শক্তিশালী করা বা ব্যাংকে-বীমায় চাকুরী করা, তাহ'লে সে বিষয়ে অধ্যয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত হওয়া উভয়ই হারাম হবে *(শায়েখ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/৩৩৫; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৪/২৩২)*।

প্রশ্ন (১০/১৩০) : বঙ্গানুবাদ কুরআন বা তাফসীর ওযূ ছাড়া স্পর্শ করা যাবে কি?

-শিহাব বিন হাসান, রংপুর।

উত্তর : বঙ্গানুবাদ কুরআন বা তাফসীর গ্রন্থ ওযূ ছাড়া স্পর্শ করা যাবে। কারণ এগুলোকে মুছহাফ বলা হয় না। এগুলোকে তাফসীরের গ্রন্থ হিসাবে গণ্য করা হয়। তাই মুছহাফ থেকে এদের হুকুম ভিন্ন। আর যে মুছহাফে কেবল কুরআনের আরবী পাঠ ছাড়া অন্য কিছু নেই তা ওযূ ছাড়া স্পর্শ করা উচিৎ নয় *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৭/৩৮, ১৩/৯৭; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/২৬৭; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৪/১৩৬)*। কারণ আল্লাহ বলেন, এটি পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করবে না *(ওয়াকি'আহ ৫৬/৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না *(ইরওয়া হা/১২২; মিশকাত হা/৪৬৫; ছহীহুল জামে' হা/৭৭৮০)*।

প্রশ্ন (১১/১৩১) : ছেলেদের বুক, হাত, পিঠ বা উরুর উপরের চুল বড় হয়ে গেলে কেটে ফেলা যাবে কি?

-আবু হুযায়ফা, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : পুরুষের বুকে, পিঠে, উরুতে বা হাঁটুর ওপরে যে চুল গজায় তা অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেলে তা কাটা বা ছেঁটে ফেলা নাজায়েয নয়। কারণ এ ধরনের চুল সম্পর্কে শরী'আতে কোন স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। সেজন্য এগুলো রাখা বা অপসারণ করা ব্যক্তিগত পসন্দ, পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্যবোধ বা সামাজিক প্রচলন অনুসারে করা যেতে পারে *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২/০২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হালাল হ'ল যা আল্লাহ তাঁর কুরআনে হালাল করেছেন এবং হারাম হ'ল যা আল্লাহ তাঁর কুরআনে হারাম করেছেন। আর যা নিয়ে আল্লাহ চুপ থেকেছেন, তা হ'ল যা তিনি ক্ষমা করেছেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে এতে যেন নারীদের অনুকরণ না ঘটে *(তিরমিযী হা/১৭২৬; মিশকাত হা/৪২২৮, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/১৩২) : ছাহাবী আলক্বামাহ (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনা যেখানে বলা হয়েছে, তিনি মায়ের চেয়ে স্ত্রীকে বেশী ভালোবাসার কারণে মৃত্যুর সময় তার খুব কষ্ট হচ্ছিল এবং কালেমা আসছিল না। এই ঘটনাটি কি সত্য?

-আব্দুছ ছামাদ, কলকাতা, ভারত।

উত্তর : হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থে উক্ত মর্মে একটি দীর্ঘ ঘটনা পাওয়া যায়। তবে কোনটির সনদ ছহীহ নয়। বরং আলবানী (রহঃ) এর সনদকে মওযূ' বা জাল বলেছেন *(যঈফাহ হা/৩১৮৩; বিস্তারিত, মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল্লাহ বামুসা রচিত 'কিতাব ইসআফুল আখইয়ার ২/৩৩৩-৩৩৬)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩৩) : চিকিৎসা বা অন্য কোন প্রয়োজনে জোঁকের তেল (Leech Oil) ব্যবহার করা হালাল হবে কি?

-কাওছার মাহমূদ, রাজশাহী।

উত্তর : জোঁকের তেল ব্যবহার করা যেতে পারে যদি তার উপকারিতা প্রমাণিত হয়। শা'বী (রহঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম ওষুধ হ'ল লাদূদ (মুখের এক পাশে দিয়ে ঔষধ ঢোকানো), সাউত (নাকে দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করানো), হাঁটা-চলা, হিজামা (রক্তশোধন) এবং জোঁক *(মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/২৩৪৩৩. বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত হলেও তা মুরসাল)*। ভাষাবিদ ইবনুল মানযূর বলের, আল-আলাক (জোঁক) এটি পানিতে থাকে এবং এমন একটি ছোট লালচে কীট যা শরীরে লেগে রক্ত চুষে নেয়। এটি গলা-সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় এবং রক্তজমাট-জাতীয় ফোলার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কারণ এটি মানুষের শরীরে অধিক রক্তকে শোষণ করে নেয় *(লিসানুল আরব ১০/২৬৭)*। অতএব এর বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার থাকলে কেউ এর মাধ্যমে চিকিৎসা নিতে পারেন।

প্রশ্ন (১৪/১৩৪) : আমরা দুই ভাই ও এক বোন। পিতা মারা যাওয়ার পর মা যে পেনশন পান, তা দিয়ে নিজের যাবতীয় খরচ করার পরও কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে। মা সেই অবশিষ্ট টাকা আমার ভাইদের বা তাদের সন্তানদের না দিয়ে শুধুমাত্র আমাকে (মেয়ে) ও আমার সন্তানদেরকে দিয়ে থাকেন। এক্ষেত্রে আমার মা ও আমি কি গোনাহগার হব?

-মুনীরা বেগম, ঢাকা।

উত্তর : মেয়ে বা নাতনী অসহায় হয়ে থাকলে মা তাদের প্রতি অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে পারেন। কারণ পিতার মৃত্যুর পর তার পেনশনের মালিক এক মাত্র মাতা। আর মা তার সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে স্বাধীন। তবে মেয়ে অসহায় না হ'লে অতিরিক্ত অর্থ একপাক্ষিকভাবে কেবল তাকেই দান করা যাবে না। বরং সন্তানদের দান বা হেবা করার ক্ষেত্রে অবশ্যই ইনছাফ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপহার প্রদানে সমতা রক্ষা কর, যেমন তোমরা পসন্দ কর যে, তারা তোমাদের সাথে সদাচরণ ও ভালোবাসার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করবে' *(ত্বাবারাণী, ছহীহুল জামে' হা/১০৪৬)*।

প্রশ্ন (১৫/১৩৫) : জনৈক আলেম বলেছেন, যে ব্যক্তির ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই, তার জন্য মাযহাব মানা জায়েয। এ বিষয়ে সঠিক বিধান কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : নির্দিষ্টভাবে কোন একটি মাযহাবের অন্ধ অনুসরণ

নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তিকে অন্ধভাবে অনুসরণীয় মনে করাও নিষিদ্ধ। মূলত ফৎওয়া গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল স্তরের মানুষের জন্য যরূরী হ'ল, দলীল জেনে নেওয়া। ছাহাবীগণ একটি বিষয়ে একাধিক ছাহাবীর কাছে জানতেন *(আবুদাঊদ হা/৪৬৯৯, ৩৬৪১ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১১৫, ২১২)* এবং পরস্পরের নিকট দলীলও চাইতেন *(তিরমিযী হা/৩০০০ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩৫৫৪)*। তবে দলীল বুঝার ক্ষমতা না থাকলে যিনি যিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ফৎওয়া দেন এবং যিদ ও হঠকারিতা থেকে মুক্ত সেরূপ যোগ্য ও আল্লাহভীরু আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া গ্রহণ করতে হবে *(নাহল ১৬/৪৩-৪৪)*। এরপরেও কোন আলেম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দলীলবিহীন ফৎওয়া দেন, তাহ'লে তার দায়িত্ব তার উপরেই বর্তাবে *(আবুদাঊদ হা/৩৬৫৭ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২৪২)*।

প্রশ্ন (১৬/১৩৬) : স্বামী আমার অনুমতি ছাড়াই দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। কিন্তু তিনি আমার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করেন। অথচ আমি এটা মানসিকভাবে মেনে নিতে পারি না এবং কষ্ট পাই। এজন্য স্বামী গোনাহগার হবে কি?

-জান্নাতী বেগম, নওগাঁ।

উত্তর : স্বামী গোনাহগার হবেন না। কারণ স্বামী যা করেছেন তা শরী'আত অনুমোদিত। আর যে বিধান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বৈধ করেছেন তা স্ত্রীর মেনে নিতে না পারা তার ঈমানী দুর্বলতার পরিচয়। মানবীয় কারণে কষ্ট অনুভব করলেও সেটা ধৈর্যের সাথে মেনে নেয়ার মানসিকতা থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলার জন্য হালাল হবে না তার কোন মুসলিম বোনের তালাক চাওয়া। যাতে করে তার স্বামীর ভাগটুকু পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে এসে যায়। কারণ সে তো তাই পাবে যা তার ভাগ্যে লেখা আছে *(বুখারী হা/৫১৫২)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, কোন মহিলা যেন অন্য মহিলার তালাক না চায় যাতে করে তার স্বামীর ভাগটুকু পুরোপুরি নিজের আয়ত্বে এসে যায়' *(বুখারী হা/২১৪০; মুসলিম হা/১৪১৩)*। অন্যদিকে স্বামীর জন্য নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী তার স্ত্রীদের মধ্যে ইনছাফ করা আবশ্যক। যেমন স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও মৌলিক চাহিদা পূরণ, তার নিকটে রাত্রি যাপন, ভালোবাসা প্রদর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রসমূহে। কারণ নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কারো যদি দুই স্ত্রী থাকে এবং সে তাদের একজনের দিকে পক্ষপাত করে (অন্যজনের হক পূরণে অবহেলা করে), তবে ক্বিয়ামতের দিনে সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার দেহের এক পাশ ধ্বসে পড়বে' *(আবুদাঊদ হা/২১৩৩; ছহীহুল জামে' হা/৬৫১৫)*।

প্রশ্ন (১৭/১৩৭) : একটি বর্ণনায় এসেছে যে, বনু আদমের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহ্র কাছে তার সন্তান বৃদ্ধির জন্য দরখাস্ত করলে আল্লাহ ইবলীসের আবেদন মঞ্জুর করে বলেন, প্রতি একজন বনু আদমের বিপরীতে তোমার সন্তান জন্ম হবে ১০ জন করে। বর্ণনাটি ছহীহ কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : শয়তান ও তার সন্তানেরা আদম সন্তানের বিরুদ্ধে ক্বিয়ামত পর্যন্ত যুদ্ধ করবে, তাদের বিভ্রান্ত করবে ও জাহান্নামের পথে পরিচালিত করার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবে। তাদের বিভিন্ন নাম রয়েছে এ কথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে কিভাবে তার সন্তান জন্মগ্রহণ করে সে ব্যাপারে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন বর্ণনা নেই। বরং কিছু বিদ্বান তার সন্তান জন্মের ব্যাপারে বিভিন্ন কল্পকাহিনী বর্ণনা করেছেন যার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই *(তাফসীরে আযওয়াউল বায়ান ৩/২৯২-৯৫)* অতএব সেগুলো বিশ্বাস করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৮/১৩৮) : অতীতের গোনাহের জন্যে ক্ষমা চেয়ে তওবা করে ফিরে আসার পর ঐ গোনাহ নিয়ে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তাকে সত্য বলা উচিত কি? নাকি এড়িয়ে গিয়ে নিজের গোনাহ লুকানো উচিত?

-ইছমত আরা, চাঁদপুর।

উত্তর : নিজের গোনাহ অবশ্যই গোপন রাখবে। কেউ জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার সমগ্র উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্ত থাকবে তবে প্রকাশ্যে পাপকারীরা ব্যতীত। আর প্রকাশ্যে পাপ করা বলতে এরকমও বুঝায়, এক ব্যক্তি রাতে কোন গোনাহ করল, আল্লাহ তা ঢেকে রাখলেন। কিন্তু সে সকালে উঠে লোকদের বলে বেড়ায়, হে অমুক! গতরাতে আমি অমুক অমুক গোনাহ করেছি। অথচ সে রাতভর তার প্রতিপালকের পর্দার মধ্যে ছিল। কিন্তু ভোরে উঠে নিজেই আল্লাহ্র পর্দা উন্মুক্ত করে দেয় *(বুখারী হা/৬০৬৯; মিশকাত হা/৪৮৩০)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা এই নোংরা কাজে (গোনাহে) লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাক, যেটি আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। আর কেউ যদি কখনও এতে জড়িয়ে পড়ে, তবে সে যেন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকে (অর্থাৎ প্রকাশ না করে) *(ছহীহাহ হা/৬৬৩)*। এমনকি অন্য মুসলিম ভাইয়ের গোনাহ সম্পর্কে জানলেও তা গোপন রাখবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি আড়াল করবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটিও আড়াল করে দেবেন' *(বুখারী হা/২৪৪২; মিশকাত হা/৪৯৫৮)*।

প্রশ্ন (১৯/১৩৯) : কুপ্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করার উপায় কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : নফস নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি কার্যকর উপায় রয়েছে। যথা– (১) গোনাহের জায়গা ও সুযোগ থেকে দূরে থাকা : যে পরিবেশ বা মাধ্যম নফসকে উত্তেজিত করে, তা থেকে দূরে থাকাই সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিকার। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা এই নোংরা কাজে (গোনাহে) লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাক, যেটি আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন' *(ছহীহাহ হা/৬৬৩)*। (২) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা : গোনাহ ছেড়ে দেওয়ার দৃঢ় মানসিকতা তৈরি করা। মনে এমন শক্তি তৈরি করা যে, এই কাজ আমি ছাড়ব আল্লাহ্র জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ তা'আলা কেবল মুত্তাক্বীদের থেকে কবূল করেন *(মায়েদাহ ৫/২৭)*। (৩) নির্জনে আল্লাহ্র ভয় ও স্মরণ করা : গোনাহ সাধারণত একাকী অবস্থায় ঘটে। তাই আল্লাহ সর্বদা দেখছেন এমন ভয় মনে কার্যকর রাখতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার সব কিছুই দেখেন? *(আলাক্ব ৯৬/১৪)*। (৪) নফসকে বৈধ কাজে ব্যস্ত রাখা

: সেটা যেমন অবসরে পড়াশুনা, লেখালেখি ও হালাল বিনোদন প্রভৃতি। সৎকর্মহীন নফস শয়তানের কর্মশালা। দেহ ও মনকে এজন্য সর্বদা ভালো কাজে ব্যস্ত রাখতে হবে। (৫) তাক্বওয়া ও ইহতিসাব বৃদ্ধির আমল : নিয়মিত ওয়াক্তমত ছালাত আদায়, কুরআন পাঠ, সকাল-সন্ধ্যার যিকর ও নফল ছিয়াম নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা ছিয়াম রাখ, তবে সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ *(বাক্বারাহ ২/১৮৩)*।

(৬) তওবা ও ইস্তিগফারে অভ্যস্ত হওয়া : প্রতিদিন ১০০ বার আস্তাগফিরুল্লাহ পাঠ করা। এটি হৃদয় কোমল করে এবং গোনাহ কমিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী, আর ভুলকারীদের মধ্যে উত্তম হ'ল তারা যারা তওবা করে *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১, সনদ ছহীহ)*। (৭) ভালো সঙ্গী নির্বাচন করা : ভালো সঙ্গী নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে আর খারাপ সঙ্গী খারাপ পথে পরিচালিত করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ তার বন্ধুর আদর্শের অনুসারী হয়। সুতরাং তার বন্ধু নির্বাচনের সময় এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত, সে কাকে বন্ধু নির্বাচন করছে *(আবুদাউদ হা/৪৮৩৩; মিশকাত হা/৫০১৯)*।

প্রশ্ন (২০/১৪০) : আমি একজনের সাথে যেনা করে ফেলেছি। এখন তওবা করেছি। ছেলেটি দ্বীনদার না হওয়ায় বর্তমানে আমি তাকে বিবাহ করতে চাই না। এক্ষণে তাকে বাদ দিয়ে অন্য কোন দ্বীনদার পাত্র বিবাহ করতে চাই। এতে উক্ত ছেলের অধিকার বিনষ্ট হবে কি?

*-*তমা, মিরপুর, ঢাকা।*
[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]

উত্তর : প্রথমত যেনায় লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ্র নিকট খালেছ নিয়তে তওবা করবে এবং নিজের পাপের কথা কারোর সামনে প্রকাশ করবে না *(বুখারী হা/৬০৬৯; মিশকাত হা/৪৮৩০)*। **দ্বিতীয়ত** তওবা করার পর অভিভাবকের সম্মতিতে যেকোন নেককার ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। কারণ পূর্বের ছেলের সাথে যে সম্পর্ক ছিল তা ছিল অবৈধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অনুশোচনাই হ'ল তওবা। আর যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে তাওবা করে, সে যেন গোনাহমুক্ত ব্যক্তির মত *(তাবারাণী কাবীর হা/৭৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৮০৩)*।

প্রশ্ন (২১/১৪১) : একজন মেয়ের পূর্বে মোবাইলে পারিবারিক ভাবে বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ বা দাম্পত্য সম্পর্কে লিপ্ত হয়নি। মেয়েটি নতুনভাবে অভিভাবকের উপস্থিতিতে দুই সাক্ষী নিয়ে আমার সাথে পুনরায় বিয়ে করে। পরবর্তীতে মেয়েটি সাক্ষী ও নোটিশসহ ঐ স্বামীকে তালাক দেয়। ছেলেটিও জানায় তার কোন দাবী নেই। এমতাবস্থায় আমাদের বর্তমান বিবাহ শরী'আতসম্মত হয়েছে কি?

-রায়হান উদ্দীন, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : উক্ত বিবাহ শরী'আতসম্মত হয়নি। কারণ কারো স্ত্রী থাকা অবস্থায় আরেকজনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে না। যদি কোন বিবাহিতা নারী তার প্রথম স্বামীর তালাক ছাড়া অন্য কোন পুরুষের সঙ্গে বিয়ে করে, তাহ'লে সেই দ্বিতীয় বিয়ে শরী'আতে অবৈধ। এক্ষণে প্রথম স্বামীর সাথে মিলন না হওয়ায় তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পরপরই অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। কোন ইদ্দত পালন করতে হবে না *(আহযাব ৩৩/৪৯)*। অতএব প্রথমে অবশ্যই পূর্ব স্বামীর সাথে তালাকের মাধ্যমে সম্পর্কচ্ছিন্ন করতে হবে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে নতুন করে বিধি মোতাবেক বিবাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন (২২/১৪২) : আমি ঘুম থেকে উঠার পর যদি দেখি আমার কোন বীর্য বের হয়নি কিংবা কাপড় শুকনা। কিন্তু দু'এক মিনিট হাঁটলে দেখি এক ফোঁটা বীর্য পড়ে। এর জন্য আমার গোসল ফরয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : গোসল ফরয হবে। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে লক্ষ্য করবে পরণের কাপড়ের দিকে। যদি কাপড় ভিজা হয় বা বীর্যপাত হয় তাহ'লে গোসল ফরয হয়ে যাবে যদিও তা এক ফোটা হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, কেউ ঘুম থেকে উঠে ভিজা (বীর্য) পায়, কিন্তু স্বপ্ন মনে নেই? রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে গোসল করবে। আবার জিজ্ঞেস করা হ'ল কেউ স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু বীর্য পায়নি? তিনি বললেন, তার গোসল নেই *(তিরমিযী হা/১১৩; মিশকাত হা/৪৪১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৩/১৪৩) : আমি একজন অমুসলিম মেয়েকে বিয়ে করেছি। এখন আমার করণীয় কি?

-হাসান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : হিন্দু মেয়েকে হিন্দু অবস্থায় বিবাহ করা সিদ্ধ নয়, যতক্ষণ না সে ইসলাম কবুল করে। কারণ একই সাথে দুই ধর্মের অনুসারী নারী-পুরুষের বিয়ে বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, আর তোমরা মুশরিক নারীদের বিয়ে করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে *(বাক্বারাহ ২/২২১)*। অতএব এই বিবাহ অবৈধ হয়েছে এবং সে ইসলাম গ্রহণ করার পর তাকে পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি সে ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে বিবাহ বাতিল।

প্রশ্ন (২৪/১৪৪) : আমি অসুস্থ থাকাবস্থায় শাশুড়ি আমার কপাল ও মাথা টিপে দেন এবং বাধ্যগত অবস্থায় আমার শাশুড়ির সাথে একই রিক্সায় হাসপাতালে যাই। এক্ষেত্রে আমি গোনাহগার হয়েছি কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : শাশুড়ি মাহরাম *(নিসা ৪/২)* হ'লেও সব মাহরাম সমান নয়। অতএব স্পর্শকাতর বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম। তাই সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং নিজেকে হেফাযত করতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৭/৩৬৫-৬৬)*।

প্রশ্ন (২৫/১৪৫) : জনৈক ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে। রাতে গোসল ফরয হয়। সে সকালে তাড়াতাড়ি ওযূ না করেই ফরয গোসল করে। এ অবস্থায় সে অফিসে চলে যায়। এক্ষণে যোহর ও আছরের ছালাত আদায় করা যাবে কি? কারণ ওযূ ছাড়া গোসল করেছে।

-মুহাম্মাদ হুসাইন, সাহাপুর, দারুসা, রাজশাহী।

উত্তর : ফরয গোসলের জন্য নিয়ত শর্ত, ওযূ শর্ত নয়।

এমতাবস্থায় যোহর বা আছরের ছালাত আদায়কালে ওযূ করলেই যথেষ্ট হবে। কেননা কেউ নিয়ত করে সারা শরীরে পানি ঢাললেই গোসলের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। এই গোসলের মাধ্যমে সে পবিত্র হয়ে যাবে এবং ওযূ করে ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের মত ইবাদতগুলো করতে পারবে। তবে কেউ যদি গোসলের পূর্বে ছালাতের ন্যায় ওযূ করে গোসল করে তাহ'লে পরবর্তীতে আর ওযূ করা লাগবে না। বরং সে ওযূ অটুট থাকলে ছালাত আদায় করতে পারবে *(বুখারী হা/২৭৪; মিশকাত হা/৪৩৬)*। ইবনু আব্দিল বার্র (রহঃ) বলেন, নাপাক ব্যক্তি যদি ওযূ না করেও পুরো দেহে পানি পৌঁছে পুরোপুরি গোসল সম্পন্ন করে, তবে সে তার দায়িত্ব আদায় করে ফেলেছে। কারণ আল্লাহ কুরআনে কেবলমাত্র এটাই ফরয করেছেন যে, 'তোমরা যদি নাপাক হও, তবে পবিত্র হয়ে যাও *(মায়েদাহ ৫/৬)* অর্থাৎ গোসল করো। এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ১/১৬১)*।

প্রশ্ন (২৬/১৪৬) : আমি একজন রিক্সাচালক। দিনের বেলায় যে জায়গার ভাড়া ২০ টাকা, রাতের বেলায় সে একই জায়গায় অনেক চালক ৪০ টাকা নিয়ে থাকি। এভাবে নানা অজুহাতে ভাড়া কমবেশী করা জায়েয হবে কি?

-সজীব বিন কামাল, কুমিল্লা।

উত্তর : কষ্ট অনুপাতে রাতে ভাড়া বেশী নেওয়া যায়। তবে কারো প্রতি যুলুম করা, কারো বিপদের সুযোগ গ্রহণ করা বা অতিরিক্ত ভাড়া প্রদানে বাধ্য করা জায়েয নয়। বরং সমঝোতার ভিত্তিতে ভাড়া নির্ধারিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত *(নিসা ৪/২৯)*। উল্লেখ্য যে, কিছু অসাধু রিক্সাচালক বা অটোচালক অসময়ে মানুষকে বাধ্য করে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করে এবং মানুষকে বিপদে ফেলে দেয় যা বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যুলুম থেকে সাবধান হও; কারণ ক্বিয়ামতের দিনে যুলুম অন্ধকারের মতো হবে' *(বুখারী হা/২৪৪৭; মিশকাত হা/৫১২৩)*।

প্রশ্ন (২৭/১৪৭) : গার্মেন্টসগুলোতে মার্চেন্ডাইজিং-এর চাকুরী করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সময় বিদেশী নারী ক্রেতাদের সামনে প্রোডাক্টের প্রেজেন্টেশন দিতে হয়। তারা অশালীন পোষাক পরিধান করে। একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তার শ্রম এবং মেধা ব্যবহার করে এই ধরনের কাজগুলো করে। এরূপ কাজ হালাল হবে কি?

-রাকিব, ঢাকা।

উত্তর : মৌলিকভাবে এমন প্রতিষ্ঠানে চাকরী করা হারাম নয়, তবে এ ধরনের পরিবেশ তাক্বওয়ার খেলাফ। উত্তম বিকল্প না থাকলে নিম্নের শর্তগুলো পূর্ণ করতে হবে। যেমন- (১) দৃষ্টি সংযত রাখা এবং ব্যক্তিগত শালীনতা বজায় রাখা। (২) নির্জনতা বা একাকিত্ব এড়ানো। (৩) কথাবার্তা পেশাগত সীমার মধ্যে রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত আলাপ না করা। (৪) যে কোন অপ্রয়োজনীয় মিটিং, কল ও মেসেজ পরিহার করা। (৫) সর্বোপরি সর্বাবস্থায় তাক্বওয়া অবলম্বন করা।

প্রশ্ন (২৮/১৪৮) : আমি একটি মাদ্রাসার ক্যাশিয়ার। সতর্ক থাকা সত্ত্বেও মাদ্রাসার কিছু টাকা চুরি হয়ে যায়। যে টাকা চুরি হয়েছে তা পরিশোধ করা আমার জন্য আবশ্যক কি?

-আমীরুল ইসলাম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : যদি মাদ্রাসার ক্যাশিয়ার সতর্কতা অবলম্বন করে এবং কোন অবহেলা না করে থাকে, তবে টাকা চুরি হ'লে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ দায়ভার সেই ব্যক্তির ওপরই বর্তায়, যে চুরির কারণ হয়েছে। যতক্ষণ ক্যাশিয়ার তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে এবং প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা মেনে চলেছে ততক্ষণ তাকে দায়ী করা যাবে না। ক্ষতিপূরণ আরোপের আগে অবশ্যই যাচাই করতে হবে, টাকার হেফাযতে তার পক্ষ থেকে কোন গাফলতি বা অবহেলা ঘটেছিল কিনা। আল্লামা নাছের সা'দী (রহঃ) বলেন, 'আমানতদার তার কাছে নষ্ট হয়ে যাওয়া জিনিসের যিম্মাদার নয়, তবে যদি তার পক্ষ থেকে সীমালঙ্ঘন (ক্ষতি করা) বা অবহেলা ঘটে তাহ'লে সে তার দায়ভার বহন করবে' *(উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' হা/৯/৩৯০; ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৬/০২)*।

প্রশ্ন (২৯/১৪৯) : আমি একজনকে টাকা ধার দিয়েছি। সে এখন টাকা পরিশোধ করতে পারছে না। আমি সম্পূর্ণ টাকা তাকে দান করলে নেকী হবে কি?

-যাকির হোসাইন, গাইবান্ধা।

উত্তর : অবশ্যই। এতে কেবল ছওয়াব প্রাপ্তিই নয় বরং ঋণগ্রস্তকে ছাড় দিলে জান্নাত লাভের কারণ হবে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় বা তার নিকট পাওনা মাফ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়ায় তাকে ছায়া দিবেন। যে দিন আল্লাহ্র ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না' *(তিরমিযী হা/১৩০৬; ছহীহুত তারগীব হা/৯০৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'একজন মানুষ পুরো জীবন কোন নেক কাজ করেনি। তবে সে লোকদের ঋণ দিত। সে তার প্রতিনিধি বা দূতকে পাঠাত এবং বলত, যা সহজ, তাই গ্রহণ কর, আর যা কঠিন, তা ছেড়ে দাও এবং ক্ষমা কর। হয়ত আল্লাহ আমাদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করবেন। যখন সেই লোকটি মারা গেল, আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কখনও কোন নেক কাজ করেছ? সে বলল, না। কেবল আমার এক চাকর ছিল। আমি লোকদের ঋণ দিতাম। যখন তাকে ঋণ আদায় করার জন্য পাঠাতাম তখন তাকে বলতাম, যা সহজ, তা নাও, আর যা কঠিন, তা ছেড়ে দাও এবং ক্ষমা কর, হয়ত আল্লাহ আমাদের প্রতি ক্ষমা করবেন। তার কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি' *(নাসাঈ হা/৪৬৯৪; ছহীহুত তারগীব হা/৯০৫)*।

প্রশ্ন (৩০/১৫০) : আমি একটি ইসলামী ব্যাংকের অনুমোদিত এজেন্ট আউটলেট পরিচালনা করি। ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী গ্রাহকের টাকা জমা, উত্তোলন ও প্রেরণ সেবা প্রদান করি। এই সেবার বিনিময়ে ব্যাংক আমাকে নির্দিষ্ট কমিশন দেয়। এই কমিশন শরী'আহ অনুযায়ী হালাল হবে কি?

-রানা আহমাদ, টাঙ্গাইল।

উত্তর : এজেন্ট আউটলেট ব্যাংকেরই শাখা। সুতরাং এই শাখার কার্যক্রম ব্যাংককে সংযোগিতা করার মাধ্যম। আর আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে নয়' *(মায়েদাহ ৫/০২)*। এক্ষণে ইসলামী ব্যাংকের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, তা শতভাগ সূদ মুক্ত নয়। তারা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শারঈ পরিভাষাগুলো ব্যবহার করলেও বাস্তবে সেগুলোর যথাযথ প্রয়োগ নেই, যা নিশ্চিতভাবে সন্দেহযুক্ত। অন্যদিকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার লক্ষ্যই মূলতঃ সূদকে প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রদান করা। সুতরাং যে কোন প্রকার ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়গুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে নিরাপদ রাখে *(মুসলিম হা/১৫৯৯)*।

প্রশ্ন (৩১/১৫১) : আমি ২৫ বছর আগে বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী চাকুরীজীবি। বিবাহের সময় সিদ্ধান্ত ছিল সংসারের প্রয়োজন হ'লে চাকুরী ছেড়ে দিবে। কিন্তু সে এখন কিছুতেই চাকরী ছাড়ছে না। চাকরীস্থল আমার বাসা থেকে প্রায় ১২০ কিলোমিটার দূরে। সপ্তাহে ৩/৪ দিন সে ওখানে থাকে। চাকুরী ছেড়ে দিতে বললে সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করে। বর্তমানে বিবাহ বিচ্ছেদের পর্যায়ে চলে গেছে। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন, তেজগাঁও, ঢাকা।

উত্তর : বিবাহের সময় পরিবারের প্রয়োজনে সময় দেওয়ার চুক্তি হয়ে থাকলে এবং স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে স্ত্রীর জন্য চাকরী ছেড়ে দেয়া আবশ্যক। উছায়মীন বলেন, নারীর কর্মক্ষেত্র হ'ল নারীদের সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ, সেটা প্রশাসনিক বা টেকনিকাল চাকুরী হোক। যেমন মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল বা নার্সিং ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। এছাড়া ঘরে বসে নারীদের কাপড় সেলাই বা অনুরূপ কাজ করা। কিন্তু পুরুষদের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ করা তার জন্য জায়েয নয়। কারণ এতে করে পুরুষদের সাথে তাকে মেলামেশা করতে হয়। এটি বড় ধরনের ফিৎনা। এর থেকে সতর্ক থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর চেয়ে ক্ষতিকর কোন ফিৎনা রেখে যাইনি। বনু ইস্রাঈলের ফিৎনা ছিল নারী সম্পর্কিত' *(বুখারী হা/৫০৯৬; মিশকাত হা/৩০৮৫)*। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত তাঁর পরিবারকে ফিৎনার স্থান ও কারণসমূহ থেকে সর্বাবস্থায় নিরাপদে রাখা *(ফাতাওয়াল মারাতিল মুসলিমাহ ২/৯৮১)*। প্রথমত নছীহত করতে হবে, না মানলে শাসন করতে হবে। এতেও কাজ না হ'লে উভয় পরিবারের অভিভাবকদের মাধ্যমে ফায়ছালার ব্যবস্থা করতে হবে। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হ'লে তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে হবে।

প্রশ্ন (৩২/১৫২) : কাউকে বঞ্চিত করার নিয়ত না রেখে পালকপুত্রকে পালক পিতা-মাতা সম্পত্তির একটা অংশ লিখে দিতে পারবে কি?

-আসাদুয্যামান, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : পিতা সুস্থ অবস্থায় অন্যান্য ওয়ারিছদের বঞ্চিত করার নিয়ত না রেখে প্রয়োজন মত সম্পত্তি পালক পুত্রকে হেবা করতে পারবেন। কারণ একজন সুস্থ ব্যক্তি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি খরচ বা দান করতে পারে। আবুবকর (রাঃ) তাবুকের যুদ্ধের পূর্বে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দান করেছিলেন *(আবুদাউদ হা/১৬৭৮; মিশকাত হা/৬০২১)*। ইবনু কুদামাহ বলেন, 'হাদীছ প্রমাণ করে যে, সন্তানদের মাঝে সমতা করা ওয়াজিব। অন্যান্য ওয়ারিছেরা এর স্থলাভিষিক্ত নয় *(আল-মুগনী ৬/৫৪)*। তবে একাধিক ছেলে বা মেয়েদের মাঝে হেবা করলে সমতা বিধান পালন করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে একাধিক স্ত্রীর মাঝে হেবা করলে সমতা আবশ্যক *(মুসলিম হা/১৬২৩; মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৫৩) : আমি একজনকে মারধর ও যুলুম করে তার জমি বিক্রি করে ৫০ লাখ টাকা পেয়েছি। এখন নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সে মারা গেছে। এখন আমার ক্ষমা পাওয়ার কোন উপায় আছে কি? টাকাটা তার পরিবার বা কোন ধর্মীয় কাজে ব্যয় করলে ক্ষমা পাওয়া যাবে কি?

-ছাব্বীর, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এই যুলুমের মহাশাস্তি থেকে ক্ষমা পেতে হ'লে প্রথমে আল্লাহ্র নিকট খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে। **দ্বিতীয়ত** যুলুমের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ তার ওয়ারিছ তথা সন্তানদের ফেরত দিতে হবে। **তৃতীয়ত** তার কোন আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান পাওয়া না গেলে উক্ত সম্পদ তার নামে দান করে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, তার ওয়ারিছ বা আত্মীয়-স্বজন জীবিত থাকলে তার সম্পত্তি দান করা যাবে না। কারণ এই সম্পত্তির মালিক এখন মাইয়েত নয় বরং তার ওয়ারিছেরা।

প্রশ্ন (৩৪/১৫৪) : স্বামী স্ত্রীকে জোরপূর্বক মাযহাবী তরীকায় ছালাত আদায়ে বাধ্য করে। উক্ত স্ত্রীর জন্য করণীয় কি?

-রাশেদ, গাযীপুর।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ৬৪/১৬)*। অতএব স্ত্রীকে ধৈর্যের সাথে সময় নিয়ে স্বীয় স্বামীকে বুঝাতে হবে এবং স্বামীর হেদায়াতের জন্য বেশী বেশী দো'আ করতে হবে। কোনভাবে একত্রে থাকা সম্ভব না হ'লে স্ত্রী চাইলে খোলা-র মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন হ'তে পারে *(বুখারী হা/৫২৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৫৫) : একজন অভিনেতা যদি কোন অশ্লীল কাজের জন্য আল্লাহ্র কাছে আন্তরিকভাবে তওবা করেন এবং তারপর মারা যান। কিন্তু সেই অশ্লীল কাজগুলো (যেমন গান, নাটক, সিনেমা ইত্যাদি) মানুষের মাঝে বিদ্যমান থাকে এবং মানুষ সেগুলো দেখতে থাকে, তাহ'লে কবরেও কি সেই পাপের বোঝা অব্যাহত থাকবে?

-কামারুয্যামান, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এমতাবস্থায় আন্তরিক তওবা করতে হবে। বার বার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইতে থাকবে এবং দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করার চেষ্টা করবে। আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। তাতে তার কবরে পাপের বোঝা যুক্ত হবে না ইনশাআল্লাহ। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, অনুশোচনাই হ'ল তওবা। আর যে ব্যক্তি গুনাহ থেকে তাওবা করে, সে যেন গুনাহহীন ব্যক্তির মত *(তাবারানী কাবীর হা/৭৭৫; ছহীহুল জামে' হা/৬৮০৩)*। তবে এসব ক্ষেত্রে তার এবং তার উত্তরসূরীদের জন্য কর্তব্য হচ্ছে সম্ভবপর অশ্লীলতার

www.at-tahreek.com

উৎসগুলো মুছে ফেলা। কেননা তওবা না করলে বা কবুল না হ'লে এসমস্ত কাজ 'গুনাহ-এ-জারিয়া' বা চলমান পাপ হিসাবে অব্যাহত থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে কেউ ইসলামে খারাপ কাজের পথ চালু করল, তার নিজের গুনাহের পাশাপাশি সে পথে যারা চলবে তাদের গুনাহও তার ওপর বর্তাবে *(মুসলিম হা/১০১৭; মিশকাত হা/২১০)*।

প্রশ্ন (৩৬/১৫৬) : ইমাম যদি ভুল নিয়মে সহো সিজদা দেয় তখন মুছল্লী হিসাবে আমি কি করব? আমি কি ভুল নিয়মেই ইমামের অনুসরণ করব?

-মুহাম্মাদ শিমুল, ঢাকা।

উত্তর : ইমামের অনুসরণ করে তার সাথে সহো সিজদা দিবে। কারণ অনুকরণের জন্যই ইমাম নিযুক্ত করা হয় *(বুখারী হা/৩৭৮; মিশকাত হা/৮৫৭)*। তবে ছালাতে যদি কোন ওয়াজিব ত্যাগ করার পরেও ইমাম সহো সিজদা না দিয়ে ছালাত সমাপ্ত করেন তাহ'লে ইমামের সালাম শেষে একাকী সুন্নাতী নিয়মে সহো সিজদা দিবে। বিদ্বানগণ বলেন, মুছল্লীর উপর এটি ফরয যে, যদি ইমাম সহো সিজদা না করেন, মুছল্লীকে নিজে সেই সহো সিজদা দিতে হবে। এটিই অধিকাংশ ওলামার মত *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ২/৪৪১; বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১১/২৭৯; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/৩৯১)*।

প্রশ্ন (৩৭/১৫৭) : কাছাকাছি (৪.৬ ও ৩.৫) বয়সের ২ বাচ্চা থাকার পর যদি অনিচ্ছাকৃত আবার গর্ভধারণ হয় এবং বাচ্চারা ছোট ও তাদের যত্নের অভাব হবে এই ভেবে যদি গর্ভপাত করানো হয় তবে কি সেটি পাপ হবে?

-মণি, ঢাকা।

উত্তর : যে পরিবারের পক্ষে এক বছরের ছোট-বড় দুই সন্তানকে লালন-পালন করা সম্ভব হয়েছে, তাদের পক্ষে সাড়ে তিন বছরের ছোট আরেকটি সন্তানকে লালন করা খুবই সম্ভব। ভ্রূণ গর্ভে আসার ৪০ দিনের মধ্যেই এর মানবীয় গঠন শুরু হয়। আর এ সময় অতিক্রম হ'লে বাচ্চা নষ্ট করা যাবে না *(ইবনুল জাওযী, আহকামুন নিসা ১/১০৮-১০৯; ইবনু জুযাই, আল-কাওয়ানীন ১/২০৭; ইবনু হাযম, মুহাল্লা ১১/২৩৯)*। কারণ গর্ভপাত ঘটানোর অর্থই সন্তান হত্যা করা। যা শরী'আতে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা কর না' *(আন'আম ৬/১৫১)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্রের কারণে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি' *(আন'আম ৬/১৫১)*। তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে যদি মায়ের জীবনের হুমকি থাকে তাহ'লেই কেবল গর্ভস্থ ভ্রূণ ফেলে দেয়া জায়েয।

প্রশ্ন (৩৮/১৫৮) : সমুদ্রে বিভিন্ন ধরনের হিংস্র দাঁত বিশিষ্ট হাঙর বা অন্য মাছ থাকে সেগুলি খাওয়া জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ সাইফুল, ঢাকা।

উত্তর : হ্যাঁ, ইসলামে সমুদ্রের হিংস্র ও তীক্ষ্ণ দাঁতওয়ালা মাছ খাওয়া বৈধ যদি তা বিষাক্ত না হয় বা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়। কারণ কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তার খাদ্য হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৯৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সমুদ্রের পানি পবিত্র, আর তার মৃত প্রাণী হালাল' *(আবুদাউদ হা/৮৩; মিশকাত হা/৪৭৯, সনদ ছহীহ)*। বিদ্বানগণ বলেছেন, যে প্রাণী স্বাভাবিকভাবে কেবল সমুদ্রেই বাস করে এবং সমুদ্র ছাড়া অন্য কোথাও টিকে থাকতে পারে না এ ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর মৌলিক হুকুম হ'ল হালাল *(ফাতাওয়া আল-লাজনা দায়েমাহ ২২/৩১৩)*। এ কারণে চার মাযহাবের সিদ্ধান্ত হ'ল সমুদ্রের প্রাণী মূলত হালাল। যদিও কিছু মৎস প্রজাতি বহির্ভূত সামুদ্রিক প্রাণী রয়েছে (যেমন, দাঁত, নখওয়ালা ও খোলসওয়ালা প্রাণী) যেগুলো নিয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে, তবুও হিংস্র মাছ যেগুলোকে শরী'আত আলাদা করে নিষিদ্ধ করেনি সাধারণভাবে বৈধই থাকে। তবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে যেসব মাছকে বৈজ্ঞানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে যেমন অধিক মাত্রায় পারদযুক্ত বা স্বভাবগতভাবে বিষাক্ত মাছ, যেমন হাঙর, পিরানহা প্রভৃতি থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

প্রশ্ন (৩৯/১৫৯) : আমরা তিন জন পার্টনার মিলে একটা অনলাইন ভিত্তিক কোচিং সেন্টার খুলেছি। যেখানে জজ, উকিল ইত্যাদি পেশার কোচিং করানো হয়। আমি সেন্টারের ওয়েবসাইট তৈরী, এড পরিচালনা, রেকর্ডিং করা ইত্যাদি কাজগুলো করি। আমাদের শিক্ষিকারা বেপর্দা অবস্থায় জুম-এ ভিডিও ক্লাস নেন। সেকারণ একদল বেপর্দা নারীদের ভিডিও, ছবি ইত্যাদি নিয়েই আমাকে কাজ করতে হয়। এরূপ চাকরী করা জায়েয হবে কি?

-তাওফীক আহমাদ, রাজশাহী।

উত্তর : অশালীনতা প্রচার এবং দেখার কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। যদি এটা করতে বাধ্য করা হয় তাহ'লে উক্ত চাকরী করাও যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর *(মায়েদাহ ৫/০২)*।

প্রশ্ন (৪০/১৬০) : একটি হাদীছে এসেছে যে, শা'বান মাসে বেশী বেশী ছিয়াম রাখার কারণ জিজ্ঞেস করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এ বছর যারা মারা যাবে, তাদের নাম এই মাসেই লিখে নেয়া হয়। এজন্য আমি পসন্দ করি যে, আমার নামটা যখন তালিকাভুক্ত করা হবে, তখন যেন আমি ছিয়ামরত থাকি'। হাদীছটি কি ছহীহ?

-শামসুল আলম, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ এবং মুনকার *(আবু ইয়া'লা হা/৪৯১১; যঈফাহ হা/৫০৮৬; যঈফুত তারগীব হা/৬১৯)*। বরং শা'বান মাসে অধিকহারে ছিয়াম পালনের ব্যাপারে উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'শা'বান মাস রজব এবং রামাযানের মধ্যবর্তী এমন একটি মাস যে মাসের (গুরুত্ব সম্পর্কে) মানুষ খবর রাখে না। অথচ এ মাসে আমলনামাসমূহ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটে পেশ করা হয়। তাই আমি পসন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহ্‌র নিকটে পেশ করা হবে আমার ছিয়াম পালনরত অবস্থায়' *(নাসাঈ হা/২৩৫৭; ছহীহুত তারগীব হা/১০২২)*।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর বই সমূহ

শিশু শ্রেণীর বই সমূহ

প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ

দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্ট বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বীনিয়াত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০

মাদরাসা তারবিয়াতুল উম্মাহ

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আদর্শ মুসলিম নর-নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

তাহফীযুল কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা/কিতাব বিভাগ

ভর্তি চলছে

• বালক • বালিকা ▪ আবাসিক ▪ অনাবাসিক ▪ ডে-কেয়ার

আবাসিকে এসি-নন এসির ব্যবস্থা রয়েছে

প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক | শায়খ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-মামূন সালাফী

যাত্রাবাড়ী শাখা, ঢাকা:
৭৯/০২/জি, বিবির বাগিচা, গেইট-৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা-১২০৪। ০১৬১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০

কামারজুরী শাখা, গাজীপুর:
৮৭৪, কামারজুরী, সাইনবোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাযীপুর। ০১৭১৩ ৮৬ ৩৪ ৯০

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 29, Issue 4, January 2026

بسم الله الرحمن الرحيم

2026

১৪৪৭-৪৮ হিজরী
১৪৩২-৩৩ বঙ্গাব্দ

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web : www.at-tahreek.com, E-mail: tahreek@ymail.com

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি

01| JANUARY
পৌষ-মাঘ | রজব-শা'বান

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
31					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

02| FEBRUARY
মাঘ-ফাল্গুন | শা'বান-রামাযান

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

● প্রতিষ্ঠাকাল : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮।

03| MARCH
ফাল্গুন-চৈত্র | রামাযান-শাওয়াল

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

04| APRIL
চৈত্র-বৈশাখ | শাওয়াল-যুলক্বা'দাহ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

05| MAY
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ | যুলক্বা'দাহ-যুলহিজ্জাহ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
30	31					01
02	03	04	05	06	07	08
09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29

06| JUNE
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় | যুলহিজ্জাহ-মুহাররম

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

● প্রতিষ্ঠাকাল : আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা, ৭ই জুন ১৯৮১।

07| JULY
আষাঢ়-শ্রাবণ | মুহাররম-ছফর

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

08| AUGUST
শ্রাবণ-ভাদ্র | ছফর-রবীঃ আউঃ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

09| SEPTEMBER
ভাদ্র-আশ্বিন | রবীঃ আউঃ-রবীঃ আখের

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

● প্রতিষ্ঠাকাল : আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও সোনামণি, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪।

10| OCTOBER
আশ্বিন-কার্তিক | রবীঃ আখের জুমাঃ উলাঃ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
31					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

11| NOVEMBER
কার্তিক-অগ্রহায়ণ | জুমাঃ উলাঃ-জুমাঃ আখেরাহ

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

12| DECEMBER
অগ্রহায়ণ-পৌষ | জুমাঃ আখেরাহ-রজব

শনি	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহঃ	শুক্র
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

আরবী তারিখ চন্দ্রোদয়ের উপর নির্ভরশীল

কার্যালয় : নওদাপাড়া (আম চত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০, ০১৭৭০-৮০০৯০০